আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে কিছু বিদেশী কবি এবং সমালোচকের মন্তব্যঃ—

'প্রকৃতপক্ষে আমি তথাকথিত কোন আধুনিক কবিতার প্রতি আসক্ত নই। একদা এক তরুণ কবির সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কথায় কথায় সে তার যুগের অন্যান্য কবিদের সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ভাব প্রকাশ করে ফেলল। একজনের প্রসঙ্গ তুলতেই বলে ফেললাম,—তার লেখায় ছন্দ আছে, সুর আছে। এই'ত!' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ও শুধু গান লিখেই গেছে। ওগুলো কবিতাই নয়।' আলোচ্য তরুন কবি যেন এপ্রজন্মের কবিদের মনের কথাই বলে ফেলেছে। এদের কাছে যে কবিতায় ছন্দ মাধুর্য আছে তা বাজে কবিতা। মিল্টন বেঁচে থাকলে হয়তো এদের সম্বন্ধে বলতেন, 'গাড্ ডাম ইউ টু হেল'। কবিতা দুর্বোধ্য হবে, শুনতে বাজে লাগবে—তবেই'ত সার্থক। এপ্রসঙ্গে মনে পড়ছে স্যামুয়েল বাট্লারের কথা। ভিক্টোরিয়া যুগের একটা দেয়াল পত্রিকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ—রঙিন অনেকগুলো ফুল শোভা পাচ্ছিল সে পত্রিকায়। তা দেখে বেয়ে আসে কিছু মৌমাছি, ফুলগুলো ঘিরে গুন গুন গুন শুরু করে। প্রত্যেকটা ফুলে মধু খোঁজে তন্ন তন্ন করে। খোঁজাই সার। বুঝতেই পারে না ফুলগুলোতে মধু নেই।' **বিখ্যাত ইংরেজ কবি উইলিয়াম এম্পসন।**

'আমার ব্যক্তিত্ব, আমার কবিতার সিংহভাগটাই সেকেলে। মুখ্যতঃ আমি প্রাচীন ইংরেজী কবিতার একনিষ্ঠ ভক্ত। মুক্ত ছন্দ আমি লিখেছি বটে তবে তা পড়লে বিদগ্ধ পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারবেন এর রচয়িতা ছন্দবদ্ধ কবিতায় সিদ্ধহস্ত। ত্রিশের দশকেই আমি কবিতা লেখা শুরু করি, জন্ ক্রো র‍্যানসম এবং অ্যালেন টেট্'এর প্রভাবে প্রভাবিত হই। এঁরা দু'জনেই ঐতিহ্য ঘেঁষা, এলিয়ট এবং পাউণ্ডের প্রভাব থেকে আধুনিক কবিতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁরা ছন্দাশ্রিত, তবে সে সুর ছন্দ কিছুটা কষ্টকল্পিত, কিছুটা কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট—যা আমি পরিণত বয়সে উপলব্ধি করতে পেরেছি। **'লাওয়েল' আমেরিকার শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিদের অন্যতম।'**

'বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবিরা বিভিন্ন রকম কাব্য রীতি এবং ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে কবিরা বিভিন্ন কবিতায় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্টাইল প্রয়োগ করেছেন। সাধারণ ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নির্দিষ্ট সূত্র কেন্দ্রিক আধুনিক কবিরা (উপমাগুচ্ছ সর্বস্ব এবং প্রাণহীন শব্দচয়ন ভিত্তিক। কিন্তু, আমার মতে বিশেষ কোন স্টাইল এবং রীতি কোন কবিতার গুনাগুন বিচারের ভিত্তিভূমি হওয়া উচিৎ নয়। 'It is time, for us to allow the legitimacy of this, and not to let some limited theory of the language af poetry pre-judge the merits of a poem. Tho greatest of the poets of this century..........employs all levels of style as occasion and subject demands.' John Heath Stubb, a critic and an editor.

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের 'আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।

পরিচ্ছেদ :

মেঘলোকে

পাহাড় আর মেঘ কুয়াশার লীলাক্ষেত্র দার্জিলিং।
ঘুমের পাহাড় আট হাজার ফুট উঁচুতে
যেন ঘুমিয়েই থাকে অনচ্ছ অন্ধের আড়ালে
চব্বিশটা ঘণ্টা !
মাঝে মাঝে এমন হয় জমজমাটি অন্ধকার ভেদ করিতে
পারে না চোখের প্রখর দৃষ্টিও।

এ যেন ধোঁয়াময় রূপ কথার দৈত্যের উদরে
প্রবেশ করেছি আমরা।
গাড়ী চলে, যেন অতি সাবধানে রাস্তার সন্ধানে ;
ভয়ে মরি রাস্তা না পেয়ে খুঁজি নেবে যাই খাদে
এবং জীবন্ত সমাধি লাভ করব আমরা।

তবুও ভাল যে শিহরণ জাগে
ভয় মিশ্রিত শংকাতুর আনন্দ,—
অতি দুর্লভ বস্তু মহাকাশচারীর মহাকাশ ভ্রমণ।

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, হিমেল হাওয়ায় যেন হয়ে যায়
শরীরটা জমাট এক শিলা,
তবুও মন ময়ূর পুচ্ছ তুলে নাচে আত্মহারা বিহ্বলা।
দুরন্ত দুর্বার অভিযাত্রীর দুর্লভ অভিযান
ভয়াল কুটিল লোমহর্ষক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার
যে আনন্দ তারই সন্ধান।

হঠাৎ, অন্ধকারের বক্ষ চিরে বীর দাপটে আসছে কারা ?
ছায়া মূর্তি, নন্দি ভৃঙ্গি মরণ লোকের ?
না, না না।   ঐ'ত ওরা—
দুটো গন্ড গন্ড'ত নয়,
যেন আধফোটা সতেজ সুবল টুকটুকে লাল গোলাপ।

১

যেন ঘনকৃষ্ণ মেঘ চিরে যাওয়া দুটো চকমকি
চোখ ধাঁধানো বিজলি রেখা।

আহারে! পাহাড়ি মেয়ে, পাহাড়ী মেয়ে,
কী অনিন্দ্য সুন্দর!

বক্ষে রেখেছে চেপে দুটো পুস্তকধারী থলে
বুঝি সামলাতে চায় আপন বক্ষের উড্ডীয়মান চূড়ো!
ক্ষণিক আগেই দেখেছিলাম
পদ্ম ডাঁটার পদ্ম পাতায় রাখা দুটো আনন—
কমল যুগল।

মনে জেগেছিল কমল-চয়ন-বাসনা।
জীবনে কখনো কোন পদ্মে পারিনি যে দিতে
তৃষাতুর ঠোঁটের প্রবল পরাগ!

তবুও'ত ভাল, আমি ভালো আছি,
নারী বিবর্জিত জীবন পেয়েছে প্রকৃতির মাঝে মুক্তি,
সাধারণ ক্লেশ দুর্বলতা, তুচ্ছ আকর্ষণ, পাশববৃত্তি
স্বার্থপরতা পারেনি রুখিতে মম স্বর্গ-আরোহণ।
আমি অমৃতপায়ী, অকুতোভয়, মৃত্যুঞ্জয়ী সুন্দর পূজারী
কেবলই চলেছি অসীমের পানে, চরৈবেতিঃ, চরৈবেতিঃ
এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

কুয়াশার মতো মেঘ।
মেঘের মতো হাল্কা অস্তিত্ব আমার
পাহাড়ের অতল খাদ বেয়ে ঝটিকা গতিতে ঊর্ধ্বমুখী—
নিজেকে বিলিয়ে দেই চায়ের বাগানে
পাইন ফারের বনে,
খোলা জানলা দরজার ফাঁকে মানবের মনে,
সুখ শয্যায়।

দার্জিলিং-এর আবহাওয়া—রৌদ্র ছায়ার কোলাকুলি,
এই গরম, এই শীত,
লোকে বলে দার্জিলিং মতিচ্ছন্ন পাগলি,
জানে না কেউ কখন কোন বেশ নেবে।
চতুর্দিকে পাহাড়-বেষ্টিত সুগভীর খাদ—
এতো মেঘের জন্ম কী করে যে হয়।
কখনো কখনো খাদের বুক আঁকড়ে পড়ে
থাকে আদুরে শিশুর মতো—
মনে হয় ধোঁয়ার বারিধি।

পরক্ষণেই চুপি চুপি উঠে আসে নিভৃতে
গিলে খেতে চায় গোগ্রাসে শহরটাকে।
চোখের পলকেই জানলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে,
বায়না ধরে—এটা দাও সেটা দাও!
তাড়াতাড়ি দরজা জানলা বন্ধ করে কিছু মেঘ
বন্দী করেছিলাম,
মেঘের কাচ পেলব গায়ে হাত বুলিয়ে
দেব ভেবেছিলাম।
কিন্তু, কোথায় মেঘ!

এসময় ধোঁয়ায় ঢাকা অলকাপুরী দার্জিলিং,
পাহাড়ের রানী দার্জিলিংকে দেখে
মায়া হয়, পীড়িত হয় মন—
সর্ব সৌন্দর্য, সর্ব রূপ রঙ, সর্ব বৈভব বৈচিত্র্য যে লুপ্ত!

তবে, লেবঙ্গ কার্ট রোড আর ম্যালের পশ্চাতে
অলস আলসে মনের হরষে পদচারণাতে
ভেবেছি—কুয়াশার হিংস্র তাণ্ডব এ'ত নয়।
এ যে স্বপ্নের ছায়া ছায়া অস্পষ্ট আবছা একটা ভাব ;
স্বপ্নের স্পষ্ট নয় কিছুই, কুয়াশার একটা পাতলা
আবরণে আবৃত যে স্বপ্নরাজ্য,

যেন স্বপ্ন দেখছি।
জেগে স্বপ্ন দেখার মতো অলিক কিছু নয়।
ঐযে পাইন গাছগুলো এমনিতে বেশ সতেজ সবুজ,
হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়েও ছায়া ছায়া
অস্পষ্ট আবছা ; সামনে দিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো—
যেন কায়াহীন অশরীরী কিছু।

সন্দেহ জাগে পাতালেই আমি,
না প্রেতলোকে ?
না, আমি মেঘলোকে।
মেঘকে স্পর্শ করতে পারি।
মুঠো করে নিতে পারি একমুঠো মেঘকে।

কিন্তু, কখন যে মেঘ এসে ডিঙিয়ে যায়
ছুঁয়ে যায় আমাকে বুঝিতেও পারি না।
শুধু ওপারের মেঘ দেখে ভাবি
এ পাহাড়েও মেঘ আছে।
এ পাড়ের ম্যালকেও ডিঙিয়ে যায় কুয়াশার
মতো হালকা মেঘ, মোষের মতো তেজি
কালো কালো মেঘ
এবং তুলোর মতো সাদা ধবধবে মেঘ।

ম্যালে উর্বশী

সেদিন, জলদের ফাঁকে তপনের প্রশান্ত হাসি দেখে
দিন কয়েক বৃষ্টি ভেজা স্নাত স্নিগ্ধ সবুজে ঘেরা
দার্জিলিং সুন্দরীর রূপে অবগাহন করব বলে
পা বাড়িয়েছিলাম ম্যালের উদ্দেশে
স্নো-ভিউ ছেড়ে
বেলা আড়াইটের পর।

দেখি এক আশ্চর্য রূপ—
স্বর্গরূপের একটি কণা নৃত্যপটীয়সী।
অগুন্তি চম্পক কুসুম-সৃষ্ট দেহবল্লরী
যেন বিধাতার অপূর্ব বৈভব মাহাত্ম্যের জীবন্ত বিজ্ঞপ্তি।

একটি হ্যাণ্ডবল নিয়ে খেলছে।
চোখে মুখে বিজলি ঠিকরে পড়ছে
নীলাভ থেকে।
মেঘ বিচ্ছুরিত সৌদামিনী?
তারই মতো রঙ, হাস্যচ্ছটা, অঙ্গুলি, চোখের চাহনি।

আশ্চর্য! লাস্যময়ী সুন্দরীর পদ্মরক্তিম হস্ত পরশে
বলটাও যেন সপ্রাণ
ললিতার ললিত স্পর্শে ফিরে পেয়েছে প্রাণ।
বারে বারে লম্প দিয়ে ওঠে
গোলাপী ওষ্ঠ স্পর্শিতে চায়,
সমুন্নত অমৃত ভাণ্ডধারী বক্ষোপরে মত্ত হস্তি সম প্রায়।

বক্ষ ভূষণ ওড়না অপসৃত করে রোমাঞ্চিত!
কিন্তু, নিঠুরা রমণী শোনে কি বলের হৃদয় বারতা?
হাস্যে লাস্যে ললনা রত্ন নাচিয়ে নাচিয়ে তারে
ছোটে এদিক সেদিক অগ্রে পশ্চাতে
যেন নৃত্যরত উর্বশী ইন্দ্ররাজ রঙ্গশালায়।

তারি সাথে মম হৃদয় নাচে ময়ূরীর ছন্দে,
ছোটে তার পিছু পিছু, যেন অবোধ শিশু চাহে
অঞ্জলি ভরে ধরে নেবে চন্দ্রাননীর স্মীত হাস্যে—
স্বর্গীয় দ্যুতি।

প্রেমালাপে ব্যর্থ বল অবশেষে
পদযুগলে লুটায়ে বলে ঃ ক্ষম মোরে,
দয়া কর সুন্দরী, জ্যোতিষ্ক সম দ্যুতিময় ;
তব স্বর্গপ্রতীম দেহবল্লরীতে আমাকে পার না জড়াতে
তব অমৃতভান্ড সৃষ্টির মূল, তাতে
একটি বার চুমুক তুলি—
শুধু একটি বার, শুধু একটিবার তব নয়ন মণি,
তব হৃদয়ের বৃন্দাবন রাখাল হই !

কে শোনে কার কথা।
মেঘ সন্দর্শনে আত্মভোলা শিখী বল নিয়ে খেলে,
খেলে নাচে মেঘলোকের উন্মুক্ত রঙ্গশালায়।
কালনাগিনীর মতো কুন্তল গুচ্ছ দোলে তার,
যেন দুর্বিনীত বলে করিবে দংশন
প্রচন্ড রোষে।

কিন্তু, না।
বলটার তালে তালে অনিন্দ্য সুন্দরী নাচে
এক দুই, এক দুই। আনন্দের উচ্ছ্বলতা
ঠিকরে পড়ে দু' চোখে।

এক সময় বল হস্তে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্লান্ত, বিস্রস্ত।
মৃত অনড় বলটাও যেন লজ্জায় মরমে মরে,
চাঁদপানা মুখ হেরি নিজেরে ভাবে বুঝি
কুব্জা মন্থরা।
ত্বরিতে ধৃত হস্ত বন্ধন শ্লথ করে
শুরু করে উল্লম্ফন, চকিতে চুম্বন করে
গোলাপ পাপড়ি মোড়া মদিরা উপচে পড়া ঠোঁটে।

এতক্ষণে জীবনের সাধ পূর্ণ হয় বুঝি তার।
চুম্বন'ত নয়, যেন উপোসী ছাড়পোকার কামড়।
অসাবধানী ললনা হিংস্র দংশনে অতিষ্ঠ,
ঠোঁট কেটে গেছে, রক্ত মাখা মুখে হবে
বুঝি চামুন্ডা রাক্ষসী !

বিব্রত সন্ত্রস্ত বলটা পালিয়ে বাঁচে দূরে।

কতো যে চুম্বন জ্বালা সইতে হয়
গোলাপ পাপড়ি মোড়া অনিন্দ্য আননে,—
ভোমড়া দলে চুমু'ত দিয়ে যাবেই ফুল ইচ্ছা ব্যতিরেকে,
কৃষ্ণতম ভ্রমরের তরেই সৃষ্টির সৃষ্ট কুসুম।

হয়তো তাই বুঝে বলটারে ক্ষমিতে
স্বহস্তে তুলে নিতে
ত্বরাপর চন্দ্রপ্রভা।
কিন্তু, দৃষ্টির অগোচরে লুকিয়ে পড়া বলে
খুঁজে পায় না সহজে !
হরিণাক্ষির চঞ্চলা আকুল দৃষ্টি—
যেন প্রিয় বিরহে মিলনার্তি।

তাই দেখে রসিক বল পায় বল মনে,
আত্মপ্রকাশ করে,
ধরা দেয় নলিনীর করে।
উল্লাস ঝিলিক খেলে যায় রমণীর নয়নে আননে।
আদ্যাশক্তি মহামায়া হয়তো এমনতর
ক্রীড়ারত, লীলা খেলামত্ত উপগ্রহ তারার রাজ্যে !

পৃথিবীর কোন সুন্দরের তুলনা চলে
এ মানব দুহিতা সাথে ?

ও লীলা, তব নয়নে প্রতিবিম্বিত ত্রয়ী :
হিন্দুস্থানের কৃষ্ণ হীরে,

দক্ষিণের অনবদ্য কারু কার্য করা সিল্ক,
ফুজিয়ামার অগ্ন্যুৎগীরণ ঃ
পার্বত্য শিখা তার দ্যুতি,
দখিণের সিল্ক তার গোধূলি
ভারতের কালো হীরে রঙ
ও লীলা !

তব কুন্তলগুচ্ছ পরিপাটি, ঘন গভীর বনানীর মতো,
দু'ধারে সুবর্ণ কর্ণ লতিকা অবধি প্রসারিত
যার কটাক্ষে হ্যামলক বিষ,
মরতেও যে ইচ্ছে করে !
তব দন্তপাটি উজল—দুটো মুক্তামালার মতো।
বক্ষে ধরেছ স্বর্গের দুটো পারিজাত—
গন্ধে রসে সৃষ্টির অপূর্ব মহিমা।

পদ্ম আঁখি, চন্দ্রানন, নাগিন-স্কন্ধ, মৃগ-পদ,
রাজহংসী-কটী, হস্তি পাছা ;
বনানী সরসি-আঁখি—
শ্বেত প্রস্তর সম শুভ্র টানা আঁখি
কাজল- পাতার মাঝে থাকে,
মৌমাছির ঝাঁক ভাবে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র লিলিফুল।

দেহবল্লরী নির্জন প্রান্তরে নদীটার মতো আঁকা বাঁকা,
কেঁপে কেঁপে ওঠে চন্দ্র লোক যেথা।

ও লীলা, তুমি কটাক্ষ হান, মনে হয় যেন
এক ঝাঁক মৌমাছি দংশিতে আসে।
যবে আঁখি পল্লব নত, মনে হয় কামদেব বাণে বিদ্ধ হয়
বিরহী হৃদয়।

সৌন্দর্য প্রতীমা !
কী সরু তব কটি দেশ—যেন জন্ম মুহূর্তেও
সুচারু খোদাই প্রতীমা।

তবে এবে তা অদৃশ্য প্রায়, ভারী স্তন ভারে ন্যুব্জ,
তাদেরই ছায়ায় অদৃশ্য এক রেখা মাত্র—
উদ্দাম আত্মহারা স্রোতা তীরে তরু সম ক্ষীণপ্রায় ক্ষীণ প্রাণ।
কামদেবের শর যেন স্ফীত বক্ষের বাম ডান।
এতো শক্ত করে গড়েছেন বিধাতা—
বক্ষাবরণ ভেদী বিদ্ধ করিতে চাহে পুরুষ হৃদয়,
যেন এভারেস্ট সম অভ্রভেদী চূ মারা,
অনন্ত কৌতূহল, অদম্য আবেগ।

কিন্তু, কটি দেশের ক্ষতি করিতে পারে না তারা,
ত্রয়ী এলাচ রেখা দ্বারা সমর্থ সক্ষম করে যে বাঁধা।

তব গুল্ফদ্বয় ছড়িয়ে থাকে না, উরুদ্বয় স্থির সুঠাম,
তব গভীরতার তিনটে দিক—স্বর, উপলব্ধি এবং নাভি,
ষড় সুউচ্চ খিলাযুক্ত প্রত্যঙ্গ—নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ
নখ, বক্ষ, এবং সন্ধিস্থল—স্কন্ধ।

পঞ্চ রক্তিম অংশ—হস্তপদ, পদপদ্ম, নেত্র প্রান্ত,
নখ এবং রসনেন্দ্রিয়,

ও লীলা!
রাজহংসীর মতো অস্ফুট তব কণ্ঠ,
আঁখিপাতা, আঁখি যেন গোলাকার খিলান।

স্কন্দদেশ শঙ্খের গড়ন,
ওষ্ঠ দেশ বিম্বফল সম রক্তিম।

ও লীলা!
গুপ্ত তব শিরা উপশিরা,
মুখখানা যেন পূর্ণ চন্দ্রিমা—
সত্যিই, সুন্দরী তুমি কাশ্মির মীনা!

তেজি ঘোটক সম স্পর্দ্ধিত পদক্ষেপ,
হস্তিসম গর্বিত নিঃশব্দ চলন!

সত্যিই, কী ভাগ্যবতী রূপসী তুমি—
রূপসী তুমি সুচারু গঠনে এবং গড়নে ;
গোল পূর্ণ চন্দ্র সম উন্নত পরিণত উরু কটি শুদ্ধ
যবে পা ফেলে ফেলে চল
যৌন উত্তেজনাবিদ্ধ হস্তিনী সম হাব ভাব তব।

নয়ন দ্বয়ে হীরের দ্যুতি, নয়ন মদিরাসক্ত,
পায়রা সম ইন্দ্রিয় বিলাসী রূপসী,
আমি কি দেখেছিলাম তোমাকে হস্তপদ্মে
হেনা রঙ মাখা, ডুব দিতে স্বচ্ছ সলিলে,—
প্রজ্জ্বলিত লেলিহান শিখা ছুটছে
ডুবছে, নাচছে, খাবি খাচ্ছে
যেন সাগর মাঝে উদীয়মান দীনমণি !

আকুঞ্চিত কেশ, মণ্ডলাকৃতি মুখ দেশ,
সুবর্ণসম দেহকান্তি, রক্তপদ্ম সম হস্ত ;
নবোদিত সূর্যসম প্রভাযুক্ত দেহ ;
চরণদ্বয় সমুন্নত, স্নিগ্ধ—আবেশে মুগ্ধ
হয় পৃথা নিশুথি স্তব্ধতার ভারে।

কিন্তু হে সুলক্ষণে,
তব নাভিদেশ দক্ষিণাবর্ত্ত ?
নখ তাম্রবর্ণ ?   পদনখে রয়েছে কি আঁকা
মৎস্য, লাঙ্গল চিহ্ন, অঙ্কুশ, চক্র, পদ্ম ?
উদরে লোমশূন্য ত্রিবলী ?
হৃদয়, স্তন লোমশূন্য ?
ও লীলা, তুমি ধন্য।

মেঘ, পথশ্রমে ক্লান্ত, অবশেষে ঠাঁই নিয়েছ
সুগন্ধি পুষ্পিত পাপড়ি দল সজ্জিত ঝুলন বারান্দায়।
লাক্ষারক্তিম রাঙা পায়ে পদ্ম মৃণাল পদ ফেলে ফেলে
হেঁটে চলেছ আবিষ্ট চিতে, লীলা !   সৃষ্টির পূজারিণী,
দার্জিলিং, তুমিই কবির হৃদে পুষ্পিত নলিনী !

ম্যালে ঝড়

হাল্কা মেঘের টিপ্ টিপ্ ঝির ঝিরে
বৃষ্টি মেখেছি গায়ে ম্যালে চলতে চলতে,
কালো মেঘের ঝড়ো তাণ্ডব দেখেছি ম্যালের
অক্সফোর্ড পুস্তক বিপণির বারান্দায়,—ওপরে
বাইরে তখন দুর্যোগ ঘনঘটা। গাছপালা,
বহিরাগতদের হাহাকার।

ম্যালের শীর্ষে অধিষ্ঠিত মহাকাল বুঝি
গাঁজার মাত্রাতিরিক্ত টানে বিভোর,
নাচছেন তা থৈ, তা থৈ, তা তা থৈ,
নৃত্যের ছন্দে পায়ে বার কয়েক তাল ঠুকেছি
আপন মনে,
আত্মাকে আনত করেছি মহাকালের পায়ে।

সেদিন ম্যালে হঠাতই দেখি
অমাবশ্যার কদাকার ভয়াবহ রূপ,
অমন ঝক্ ঝকে চেহারা যার, কালি ঝুলি মেখে
সে সেজেছে ভূত!
ম্যালের সামনে ডাঁয়ে পাহাড়ে পাহাড়
নীচে সুগভীর খাদ,—
কিছুই পড়ে না চোখে, শুধুই আঁধার।

শুধু আমারই মতো জনা কয়েক প্রতাড়ক
আবহাওয়ার শিকার—
ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্পষ্ট ছায়া ছায়া—
কায়াহীন মনে হয়।
ঘোড়াও ছুটে যায়, পিঠে বালখিল্যের দল—
ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।

কয়েকটা সতেজ লোমশ কুকুর সামনে দিয়ে চলে যায়,
যেন অশরীরী আত্মার আনা গোনা
অশুভ সংকেত বাহী।

কিছুক্ষণ বাদল ঝড়ের তাণ্ডব দেখতে দেখতে দেখি
ম্যাল কালো বোরখা নিয়েছে সরিয়ে,
তার সর্বাঙ্গ সুন্দর অবয়ব উন্মুক্ত খোলা আকাশের নীচে।

ঝড় জল থামেনি তখনো।
ওপারে ছাউনির নীচে
নর নারীরা নিয়েছে আশ্রয়,
ভিজে নেয়ে গেছে,
ছুটে আসে এ দিককার দোকানে দোকানে।
চা কফির জমে গেছে ভীড়,
কার আগে কে নেবে গরম পানীয়—
জোর প্রতিযোগীতা।

বিদ্যালয়গুলোর ছুটি।
ম্যালের ওপরের দিকে যতো নামী দামী শিক্ষা কেন্দ্র,
বেলা তিনটেয় ছুটি।
ওরা আসছে—বালক বালিকা, কিশোর কিশোরী
ওরা আসে ময়ূরের মতো পেখম মেলা
নাচতে নাচতে,
ম্যালের চত্বরটা হয়ে ওঠে
সুবিশাল এক রঙ্গ মঞ্চ।
নানা রঙ্গের পোশাক ঝল মলিয়ে ওঠে
দমকা হাওয়ায়
বিশ্রস্ত, বৃষ্টিতে ভেজা স্যাঁত সেঁতে ম্যাল।

দমকা হাওয়ার মতো ছুটে যায়
দুরন্ত এক পাল ছেলে,
মেঘ চিরে পড়েছে ঝরে,

যেন বিজলির ঝিলিক
অদৃশ্য হয় মেঘের আড়ালে।

উঁচু জুতো পরা জনা কয়েক পাহাড়ী সুন্দরী—
মডেল গার্লের মতো
সর্বাঙ্গে বিপণির পসরা,
চলে যায় ঘোড়ার খুরের মতো পা ফেলে ফেলে।
হঠাৎ কেন জানি মনে হয় আমি সুইজারল্যাণ্ডে।
হাল ফ্যাসন আধুনিক চাল চলনে কলকাতা
বোম্বাই দিল্লির আধুনিকাদের মনে হয়
এদের পেছনে।

ছাতা থাকতেও ছাতা বন্ধ,
ভিজে নেয়ে একশেষ
প্রকৃতির পায়ে সকরুণ আত্মসমর্পণ।
কয়েক ফোটা জল লেগে আছে দুটো গণ্ডে,
প্রভাতী সূর্য রশ্মি প্রতিবিম্বিত শিশির বিন্দুতে।

সাদা পোষাকপরা ছেলে—
এক ঝাঁক সাদা পায়রা
উড়িয়ে দিয়েছে যেন কেউ
শান্তি মৈত্রীর প্রচারক।

ম্যালের চত্বরে বুট জুতো পরে ওরা
দাপা দাপি করে বেড়ায়—শারদানন্দের বার্তা বাহক।
সাদা সাদা তুলো তুলো মেঘগুলোর মতো
বৃষ্টির টুপ টাপ ছন্দে
নেচে বেড়ায় মনখোলা আনন্দে ;
জামা জুতো ভিজে নেয়ে একশেষ
সমস্ত শক্তি নিঃশেষ
রঙ্গ মঞ্চ ছেড়ে যায় একে একে পায়ে পায়ে
অবশেষে।

নাবিক-নীল স্যুট কোট পরা কেতাদুরস্ত
এক ছাত্রী—যেন পাহাড়ী গোলাপ।
ধীর পায়ে ছন্দ তুলে
বাসন্তি হাওয়ার হালকা মেজাজে
প্রবেশ করে ম্যালের চত্বরে।

অমনি দুষ্টু এক হাওয়া দুরন্ত হয়ে ওঠে
উড়িয়ে নেয় তার রঙে রঙে ফুল ফুল ছাতা।
অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।
দেখে উড়ন্ত ছাতা আটছে গেছে
বৃক্ষ শীর্ষে।

হাত তালি দিয়ে উল্লসিত চীৎকার ঝরায়
কচি কাচার দল—আগে থাকতেই সাবধান,
ওদের ছাতা বন্ধ, বগলদাবা।
তখনই এক টুকরো বিজলি ঠিকরে পড়ে—
ছড়িয়ে পড়ে আকাশের হাসি।

মজা দেখতে দেখতে হঠাৎ ভাবি
বাসায় যাব কী করে ?
বৃষ্টিতে কাকভেজা হব—
দার্জিলিং'এর ঠাণ্ডা বড্ড সাংঘাতিক,
গলা ফেটে রক্ত ঝরে !

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে,
হাত পা হিম হয়ে আসে,
জনমানব শূন্য হয়ে গেছে ম্যাল।

আমি এছাতা ওছাতা করে
শেষ পর্যন্ত স্নো-ভিউ'তে পৌঁছে যাই।
স্নো-ভিউ'তে জমে গেছে সবাই
কম্বলের তলায়।

আমাকে দেখে কেউ কেউ বললে—
মারা পড়বেন মশায়।
ঘুরবেন না বেশি বৃষ্টিতে ঠান্ডায়।

বললাম—গরম কাল জ্যেষ্ঠতে এ হাল হয় যদি
শীতকালে কি করেই বা থাকে দার্জিলিংবাসী!
তারা গায়ে চাপায় যে যতো পারে গরম পোষাক,
হাতে উলের দস্তানা, পায়ে উলের মোজা,
মাথায় গরম টুপি
এক এক জন সাজে বহুরূপী।

ঘরের মধ্যে কম্বল জড়িয়ে পড়ে থাকি।
ভাবি-এবারে জলের কিছু সুরাহা হবে।
দুর্গাপুর থেকে আসা দু'তিনজন উদ্ভিন্ন যৌবনা
বলছিল—স্নান'ত দূরের কথা,
মুখ ধোয়ার জল পর্যন্তও না,
কী যন্ত্রণা!

মেঘলোকে তুষারপাত

মনে পড়ে নামরিং যাত্রার দিনটি।
নামরিং'এর বিপরীত পাহাড় জুড়ে মংপু।
পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা অফুরন্ত বাড়ী।
সাজানো গোছানো সিংকোনা বাগিচার সতেজ
সজীব সবুজ অপার্থিব সৌন্দর্যে
গড়া মংপুরানী মায়াজালে
বেঁধেছিল দিগ্বিজয়ী বিশ্বকবিকেও।

এখন বুঝি নাম রিং'এর চা গাছগুলো
সিক্ত স্নিগ্ধ শান্ত বরুণ দেবতার প্রশস্তিমুখর—
বরুণ দেবের কল্যাণেই এদের কলেবর বাড়ে,
বংশবৃদ্ধি ঘটে।
গাছগুলোকে কেটে ছেটে তৈরি রাখা হয়েছে
বাদলের ছন্দে গানে সবুজ তেজি পাতার
মুকুট মাথায় পরবে বলে।
তারাও প্রাণ পেয়েছে।

নামরিং যাত্রার প্রাক্কালে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি।
শূন্য থেকে সাদা সাদা তুষার পিণ্ড পড়তে
দেখেছি অগুন্তি।
দু'এক টুকরো তুলে মুখেও দিয়েছিলাম।
ষোল আনা নির্ভেজাল খাঁটি জল
যকৃতের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ঘটায় জানতাম।

স্নো-ভিউ'র সামনের চত্বরে গোলাপ পপি
লিলির বনে তখন প্রাণের জোয়ার—
ওরা নেচে নেচে আহবান জানায়
'আয় বৃষ্টি ঝেপে'—
দারুণ মজা!

রোমাঞ্চিত কলেবর চিত্তে
অবগাহন করছিলাম বহিঃপ্রকৃতির আনন্দ ধারায়।

হঠাৎ যেন বললে কেউ, প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি—
চা বাগানগুলোর অবলুপ্তি!
চমকে উঠলাম—'তাই'ত!
এ শিলাবৃষ্টি কি অষ্টপদ মৃগদের শাস্তি বিধান?
খুব বাড় বেড়েছে ওদের,
দিনরাত লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি
সময় সময় এতো বেশি—
বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় মেঘমালার:
কী, আমাকে উল্লঙ্ঘনের দুঃসাহস!
বলতে বলতেই শিলা বর্ষণে আপ্লুত হয়
কোকিল কালো মেঘ, কালিদাসের যক্ষদূত মেঘ,
নাস্তানাবুদ হয় অর্বাচীন বেকুব মৃগদল।

গোলাপের সতেজ পাপড়িগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে
ক্ষত বিক্ষত ফুটন্ত গোলাপও,
প্রস্ফুটিত রঙ বেরঙের পাপড়িগুলো হৃতশ্রী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

সামনে দূরে, অনেক দূরে
এখানে ওখানে উপত্যকাগুলোয় ছড়িয়ে আছে
বাগানগুলো—হ্যাপি ভ্যালি, ব্লুমফিল্ড,
ক্যালিস ভ্যালি, ঋষির হাট, চুনটাঙ্গ—
কচি কোমল চা পাতা শতচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে!

একদা ওখানে ডেরা বেঁধেছিল চা
চীন দেশ থেকে এসে।
ইদানীং, চীন আসাম সঙ্গমে নতুন প্রজন্মের
দৌরাত্ম্য। চীনের গন্ধ, আসামের রঙ—
দুয়ে মিলে জন্ম দিয়েছে যাকে
সে এখন দুর্বার দিগ্বিজয়ী।

ভারতীর আঁচলে এনে দেয় বিদেশি মুদ্রা—
দুর্লভ বিদেশি মুদ্রা।
গাছের পাতা'ত নয়, সোনার পাতা।
সোনার মাটি দার্জিলিং সোনা ফলায়—
ওজন এক কোটি কেজি।

অথচ, বিশ্বের বাজারে দার্জিলিং বিকোয়
আট কোটি কেজিরও বেশি।
দার্জিলিং নামের এমনি মাহাত্ম্য!
চা-খেকো দেশগুলোর কেউ কেউ জানে
দার্জিলিং শ্রীলংকায়, কেউ কেউ ভাবে চীনে,
কেউ কেউ আফ্রিকায়—
আসলে অন্য দেশগুলো দার্জিলিং ছাপ মারে,
রটনা রটায়।

দার্জিলিং মাটির এমনি মহিমা।
অন্য কোন পার্বত্য জমি এতো উর্বরা কিনা
আমি অন্ততঃ জানিনা।
বছর ভর ফলে ফুল কপি, বাঁধা কপি মটর শুঁটি
পালং শাক—আরও কতো কি।
এতো স্বাস্থ্যবান, এতো সবুজ, নাদুস নুদুস
দেখলে লোভ হয়
আদরও করতে ইচ্ছে করে।
আদুরে আদুরে, কচি শিশুর মতো।
স্বাদটাও ভালো সমতলের চেয়ে।

হঠাৎ দেখি বরফ পড়ছে না,
যদিও তখনো টিপ, টিপ্ বৃষ্টির সুরমূর্চ্ছনা।
নামরিং যাব কি যাবনা ভাবছিলাম

লেপ মুড়ি দিয়ে শীতের নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিলাম-
এমন সময় বিরক্তি জাগানো কণ্ঠস্বর—
'চলিয়ে সাব!'

নামরিং' এর জিপ চালক।
মনটা নেচে উঠলো দুরন্ত শিশুর মতো।
বাদলা দিনে তুষারমাখা প্রকৃতি রাজ্যে অভিসার
—দারুণ একটা ব্যাপার!
কয় জনের ভাগ্যে জোটে?

অভিসারিকা স্বয়ং প্রকৃতি, আমার প্রিয়া!
বাঁ দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রবল আবেগে
ঝোরাগুলো নেমে আসছে সশব্দে—
খল খল হাসি হেসেই যাচ্ছে
গভীর সুখানুভূতিতে আত্মহারা পাহাড়ী প্রকৃতি
হাস্যে লাস্যে চটুলা চপলা, আমাদের সাথী।

আমি আমার প্রিয়াকে উল্লসিত চিতে
চুমু খেতে খেতে চলি।
ঘুমের কাছা কাছি এগোতে না এগোতেই
চালক তর্জনি উঁচিয়ে বললে – 'দেখিয়ে',
এ্যাঁ, কী ব্যাপার?
চমৎকার!

টাইগার হিলের শিরে রুপোলি শিরস্ত্রাণ।
কে দিল শিরস্ত্রাণ পরিয়ে?
আকাশ?
আঃ, কী আরাম!
বাঘ পাহাড়ের কী স্বস্তি, যেন নেশাগ্রস্ত।

আকাশ প্রায়ই টাইগার হিল মস্তকে
পরিয়ে দেয় বরফের টুপি
স্নেহের আতিশয্যে—
ও যে আকাশের সাথী,
সর্বক্ষণ কথা কয়।
মাঝে মাঝে বাঘ পাহাড়ের মাথায়
রক্ত চড়ে যায়।

মাথা গরম'ত হবেই।
অগুন্তি ভ্রমণবিলাসী নর নারীরা
দলে দলে যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে যায়,
পা রাখে তার মাথায়।
দেখবে অরুণোদয়ের অপার্থিব প্রশান্ত রূপ—
পূবাকাশে মন-উদাসী, হৃদয় তাড়ানো
কতো যে রঙের বাহার!

ভোরের আকাশ সিঁদুর হয়ে ওঠার
বহু আগে থাকতেই জেগে ওঠে ওরা—
জেগে ওঠে দার্জিলিং শহর।
আগন্তুকরা সব কাঁচা ঘুম থেকে টেনে তোলে নিজেদের—
চিনি থেকে পিঁপড়ে ছাড়ানোর মতো।

ঘুম ঘুম চোখে কম্বল জড়িয়ে জিপে চড়ে
দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোটে—
ভোর রাতে অত্যুৎসাহী যুদ্ধবাজদের যুদ্ধ যাত্রা।
যারা গভীর সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকতে চায়
তারা বড্ড বেশি বিরক্ত হয়
শিশুর মুখ থেকে মাতৃদুগ্ধ ছিনিয়ে নেয়ার মতো।

তারা অভিশাপ দেয় হুজুকে যুদ্ধবাজদের।
সকালে ওরা ফেরে কম্বল বগলদাবা করে।
বেশির ভাগ দিনই ওদের ফিরতে হয় মুখে চুন কালি মেখে।
অরুণোদয়ের অরুণাভা মেখে ফিরতে পারে না।
যুদ্ধে যারা হারে, ঝলসে উঠিতে পায় না'ত
চোখে মুখে তাদের যুদ্ধ জয়ের আনন্দ।

সন্ধ্যা হতে না হতেই নৈশাহার সেরে
গিয়েছিল শুতে,
টিক্ টিক্ ঘড়িটাকে বলে রেখেছিল—
ঠিক সাড়ে তিনটেয় ডেকে দিও
মনে থাকে যেন।

অতি বাধ্য ঘড়িটাও তারস্বরে চেঁচালো
ঠিক সাড়ে তিনটেয়,
এবং বাঘপাহাড় যাত্রীরা উঠে পড়লো ;
হাড়ে লাগা ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে
বাঘ পাহাড় যাত্রা।
এতো কষ্ট, এতো সংগ্রাম সব নিষ্ফল।

সূর্যদেব যে কখন উঠে গেলেন আকাশে
এক লাফে, টেরই পেলে না কেউ।
এসব যুদ্ধে হারা আশাহতদের দল
বাঘপাহাড়ের গোষ্টি তোষ্ঠি করে ছাড়ে,
যে যা পারে অভিশাপ বর্ষণ করে শিরে—
মাথা গরম হবারই'ত কথা।

মাথায় বরফ চাপিয়ে বসে আছে
চুপ চাপ তাই বুঝি বাঘ পাহাড়।

লোকে বোঝে না, বাঘ পাহাড় নির্দোষ।
তপন যদি মেঘ ঘোমটার আড়ালে
কেটে পড়ে ঊর্ধ্বাকাশে কী করতে পারে
বাঘ পাহাড় ?

বাঘ পাহাড়, বরফটা ঠিক মাথায় লাগছে
না হয়তো—
একটু আলগা আলগা ভাব।
পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চেপে চেপে
দিতে পারলে ভাল লাগত—
গভীর তৃপ্তিতে বলে উঠতে হয়তো
'আঃ, কী আরাম !'

কিন্তু, সময় কই, জীপ নিয়ে তোমার মাথায়
পা দেব, সময় কই ?

চলেছি এখন চা বাগানে প্রকৃতির খেয়ালিপনা
মাথায় নিয়ে—কখন কী যে হয় !
হয়তো নাও ফিরতে পারি—
হয়তো একটা প্রকাণ্ড পাথর পাহাড় থেকে
নেমে এসে রাস্তা রোখো আন্দোলনের
ডাক দিতে পারে অকাল তখতের সন্ত্রাসবাদীদের
কিংবা উগ্র গোর্খাদের মতো।

দেখতে দেখতে ঘুমের পাহাড় এগিয়ে আসে,
একটু এগোলেই বাঘ পাহাড়
পা রাখব নাকি বাঘ পাহাড়ে ?

কিন্তু, সহযাত্রী হবেন কি রাজি ?
তদুপরি জীপখানাও'ত নার্মারিং চা বাগানের ;
—কাজে যাচ্ছি,
নিছক অভিসার'ত নয়।

ঘুম থেকে বাঁ দিকে ঘোরে জীপটা।
ঘুমের রাস্তার দু'ধারে জমাট বরফ—
যেন সাবানের ফেনা।
একটু এগোতেই দেখি রাস্তা জুড়ে শুধু বরফ
আর বরফ—
যেন অগুন্তি শ্বেত বলাকার ঝাঁক দিয়ে রাস্তামোড়া,
সুদীর্ঘ গ্রীবামণ্ডল পাখায় ঢাকা,

পাখাতে ঢেকে পড়ে আছে।
এক অদ্ভুত খেয়ালে মেতে
রাস্তা দিয়েছে ঢেকে—
সাজিয়েছে রাস্তা, কোন আনন্দে
মেতেছেন বনদেবীরা, বন পরীরা কে জানে !

নাকি স্বর্গরাজ্যের শ্বেত হস্তীর মতো দুর্লভ
শ্বেত পাথরে তৈরী এ কোন নন্দন সড়ক !

স্বর্গে যাচ্ছি,
সশরীরে স্বর্গ যাত্রী।

এক অশরীরী পুলক সর্বাঙ্গে—
কী বিচিত্র অনুভূতি।

বাঁ দিকে বরফে ঢাকা সুগভীর খাদ,
ডান দিকে সদ্যস্নাতা লাস্যময়ী উদ্ভিন্ন যৌবনা প্রকৃতি
নির্বাক দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে বরণডালা সাজিয়ে—
আমি যেন সাদা মখমলে ঢাকা রাজপথ বেয়ে
চলেছি প্রকৃতিদেবীর অন্দর মহলে
পাণিপীড়ন করব বলে।

বনদেবীর চরণ-ধোয়া জল ছল ছলো কলকলে
নাবছে পাহাড়ের গা বেয়ে
অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে, আপন আনন্দে।
দুপাশের বনে বনে ছুটে বেড়ায় কি
কস্তুরি মৃগের পাল?

ডালে ডালে শীতল শিলাখণ্ড পরে
কি এসে বসে ওরা, শোয়, গড়াগড়ি দেয়?
তাদের নাভিস্থিত গন্ধই পাচ্ছি আমি?
আঃ, কী ভুরভুরে গন্ধ!
হঠাৎ দেখি ঝোপ ঝাড় আর পাইনের মধ্যে দিয়ে
তরতরিয়ে নামে এক পাহাড়ী যুবতী।

এ বনেই থাকে বুঝি?
এখানেই কি মহর্ষি কণ্বের আশ্রম?
শকুন্তলা!

বনের মেয়ে বনের মতোই সুন্দর সহজ সরল,
জীবন ভর যে বন্য প্রকৃতি সাথে মিতালী।

পাহাড়ের খাদ বেয়ে কী সাবলীল অবতরণ !
যেন রক্ত মাংসের দেহ এ নয়,
এক ঝলক আলো দিয়ে তৈরী
বনদেবীর আপন হস্তের খেয়ালী সৃষ্টি।

ভাবতেই পারি না যে বৃষ্টি ভেজা
পিচ্ছিল পথে ওভাবে তর্‌তরিয়ে নাবা যায়।
এ মানবী হলেও হরীণীর মতো উছল চঞ্চল,
প্রকৃতির কোলে মানুষ, প্রকৃতির অংশও তাই।

বাঁ দিকের সুগভীর খাদগুলো পেরিয়ে
কাঞ্চনজঙ্ঘা, ত্রিশূল, নন্দাদেবীর দিকে দৃষ্টি
যেতেই শিহরণ জাগে প্রতি কোষে কোষে—
ভাবে এতো সুন্দরও হতে পারে কোন বস্তু পৃথিবীর ?

যেন এক একটা রত্নভান্ডার, প্রচন্ড দ্যুতি,
মনে মনে হাসি—
নিরেট জমাট তুষার পিন্ড নিয়ে
তপন দেবের এ'ত নিছক চালাকি—
বাচ্চা মেয়ের পুতুল পুতুল খেলা,
মনের সাধে সাজানো গোছানো, যেন রাতের জোনাকি।

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিয়ে পদ্য রচেন কতো
পর্যটক—দিশি বিদিশি,
দার্জিলিং এসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবে না
চোখ ভরে প্রাণ খুলে এ কি হয় ?

ভ্রমণ বিলাসী বালখিল্যের দলকেও দেখেছি
কাঞ্চনজঙ্ঘা কখন মেঘলা বসন খসাবে
কোমর থেকে জানুপর্যন্ত দেহসৌষ্টব দেখাবে
—দেবসভায় নৃত্যরত উর্বশীর বসন অঞ্চল বুঝি খসে যায়,
অলৌকিক সৌন্দর্য জঙ্ঘাপ্রদেশ মন কার না চায় ?

চিরন্তন আবেদনে সাড়া দেয় মন,
সৃষ্টি তাই টিকে আছে আজিও তেমন।

তাই, বেড়োয়াদের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা দার্জিলিং,
দার্জিলিংই কাঞ্চনজঙ্ঘা—
নবদম্পতীর মধুযামিনী যেন দার্জিলিং।
ও জঙ্ঘাপ্রদেশই রমণীর সম্বল এবং দার্জিলিং'এর।

নইলে দেব সভায় নৃত্যরত উর্বশি কেন
ভাববেন কন্দর্প-সদৃশ অর্জুন তার জঙ্ঘাপ্রদেশের
প্রতি করেছে দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং কামনাসক্ত।
অর্জুনের দৃষ্টিতে'ত ছিল বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা,
কুরুকুল-জননী যে তিনি পরমারাধ্যা।

দার্জিলিং, বিশেষ করে তোমার ঐ জঙ্ঘাপ্রদেশের
প্রতি আসক্ত নই, নন্দাদেবী ত্রিশূলের
প্রতিও সমান আসক্তি।

সিঞ্চল

দার্জিলিং, তুমি যে সৌন্দর্যের রানী,
দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দেব তব হাতছানি।
তবে, তুমি যে নিরাশ কর অনেককেই।
কখনো কখনো ওতো বেশ মুখ গোমড়া করে থাক
আশাহত অভিমানী কিশোরীর মতো—
—সৌন্দর্য চাতক বেড়োয়ারা রক্তিম অধরের ফাঁকে
শিউলি ঝরা দেখে নাক.
উজ্জ্বল আনন্দোচ্ছ্বল ভাবটা যে কোথায় লুকিয়ে রাখ

হয়তো নিজেও জান না।
হয়তো তুমি খেল আলো আঁধারির লুকোচুরি
বোঝ না যে
ওরা দু'দিনের তরে বেড়াতে আসে—
আর তোমার মেঘলা আকাশ পড়ে
বৃষ্টিতে ঝরে যেন গণ্ডদ্বয় তব
অশ্রু জলে ভাসে!

ওদের হৃদয়েও মেঘ জমে যায়.
বাসর ঘরে নব পরিণীতা অবগুণ্ঠিতা
রূপ দেখাতে না চায়!
ওকি, শুনি যে সরল-দ্রুম সঙ্গীত
হিমালয়ে দেবদারু বনে,
ঋজু বিটপি ভেদিতে চাহে গগনে—
কী স্পর্ধা—নিঃসীমের অসীমকে মানাবে হার!

তুষার শুভ্র পর্বতগাত্রে শন্ শন্ হাওয়া বয় প্রাবল্যে,
দেবদারু পাদপ সবে রোমাঞ্চিত কলেবরে
একে অপরের পরে এসে পড়ে।

মোটা মোটা ডালে ডালে—
আগুন জ্বলে—বনানীতে বহ্ন্যুৎসব—
ইন্ধন নিরীহ চামরী মৃগ অঙ্গ দহনে।
মেঘ, সহস্র ধারে এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দাও
কৃষ্ণদূত প্রেমময়ী তুমি কৃষ্ণা, বৃষ্টির আধার!

পাহাড়ের গায়ে গায়ে অগুন্তি বাঁশ সারি সারি
যেন পর্বত পৃষ্ঠে এলো চুল।
বাঁশ গাত্র পোকা কাটা—অগুন্তি ছিদ্র,
এক একটা বৃহৎ আড় বাঁশি।
হাওয়া টেনে নেয় দুরন্ত নিঃশ্বাসে
বেজে ওঠে হাজারে হাজারে।

আহা! কী সুমধুর সুর মূর্চ্ছনা!
ঐ শোন। কিন্নরীরা সুকণ্ঠী, সবে গায়।
তুমিও মেঘ, তালে তালে সুর মিলাও
গুড়্ গুড়, মন্দ্র ধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত
হিমালয়ের গুহায় গুহায়,
যেন শত সহস্র মৃদঙ্গ ধ্বনি।

আহা, কী অপূর্ব স্বর্গীয় শিবার্চনা গীতি—
কীচকের বংশীধ্বনি, কিন্নর সঙ্গীত,
আর মেঘ-মৃদঙ্গের বোল।
মেঘদূতের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়
সিঞ্চল সরসি কথা।

প্রবল বারি বর্ষণ পরে সিঞ্চল সরসি
এখন বুঝি নীরে নীরে আপ্লুত,
কলহাস্যে ছুটে আসে ঝরণাধারা কত,
এখন অপূর্ব দৃশ্য দেখা যেত!

দিন কয়েক আগেই ঘুরে'ত এলাম।
পাষাণ বাঁধাই সিঞ্চল আপন হৃদয় নিংড়ে
ফল্গুধারা পাঠায় শিরা উপশিরায়,
প্রাণ পায় দার্জিলিংবাসী।

কিন্তু, তার হৃদয়ে মমতা থাকে না শীত ফুরোতেই।
তখন দার্জিলিং জলের অভাবে তৃষার্ত কাকের
মতো ছট ফট করে, অথবা
ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো অবস্থা।

ভাবতে ভাবতে শুনতে পাই সুরেলো কিন্নরীকণ্ঠীর গানঃ
আগে নাকি সিঞ্চলে কতো পাখী ছিল,
তাদের ছিল কতো গান,
চতুর্দিশি প্রাণোচ্ছলতায় ভরপুর ছিল
তাদের ছিল কতো প্রাণ।

বনানীর তখন কী যে রূপ ছিল,
সবুজে সবুজে প্রাণবান,
তারি মাঝে তপন উঁকি দিয়ে যেত
সিঞ্চল কী যে রূপবান!

হেথায় হোথায় কতো ফুল ছিল,
হরেক রঙের বাহারি ফুল,
দিকে দিকে শুধু হাসি হাসি ভাব
কামিনী চামেলী আর বকুল।
সিঞ্চল পরে বনানী চাঁদোয়া
রোদ্দুর লাগে না গায়ে,
নীল গগণের অসীম ব্যাপ্তি
জলে পড়ে না ছায়ে।

বনানী যেন যুবতী রমণী
স্বাস্থ্যে মাধুর্যে নয়ন চটুল,
দর্শক মোর মন চুরী যায় ;
রমণী বনানীর সৌন্দর্য্যাকুল।

সেই বনানী সেই সিঙ্গল
আজি যে গো অবলুপ্ত,
স্বাস্থ্যে মাধুর্যে চটুলা রমণী
আজি হতশ্রী খর্ব'ত !

বন বাদার গাছ কেটে সাফ করে
এখানে ওখানে গরু মোষ চড়ে,
রাখনা কেন শাসন কায়েম ওগো সরকার,
বনানী সুন্দরীর সবল স্বাস্থ্য খুব দরকার

সর্বাস রূপসীর ঘোমটা যে রাখনি
যদি সজাগ না হও তোমরা এখনই
তবে ভূগোল অর্থনীতি যাবে পাল্টে,
হয়তো দার্জিলিংটাই যাবে উল্টে।

তখন ?
বিশ্ব সুন্দরী চা-এর রানী
বিশ্ববাসীকে দেবে না হাতছানি,
বাইরে থেকে টাকা আসবে না'ত ঘরে
যদি দেহ সৌষ্টব আর সুগন্ধ তরে
প্রচুর বৃষ্টি নাইবা ঝরে।

বাঙ্গালী, দার্জিলিং নিয়ে গরব তোমার
থাকবে কোথায় ?
যদি নিরীহ রূপসীর রূপ চুরি যায় !

হঠাৎ, কিন্নরী কণ্ঠ থেমে যায়।

সিমলে এখন গেলে প্রচুর বরফ পেতাম দেখতে,
শুনতে পেতাম পাহাড়ের গা ঘেঁষে নাবতে
নাবতে চঞ্চলা কিশোরীর মতো বারিধারার কলতান,
পাহাড়ে পাহাড়ীর পাহাড়ী গান।

হঠাৎ সামনে থেকে এগিয়ে আসে পাহাড়ী রমনী,
যেন পাহাড়ী দেশের নিষ্পাপ সুব্যসহীন গোলাপখানি।
থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়ীটার সামনে,
যেন বরফের সঙ্গে কথা বলছিল এতক্ষণে।

ওর পা দু'খানি সাদা,
দু'খানা নগ্ন পায়ের সহনশীলতা
আশ্চর্য রকমের।
কোন দেব অপ্সরা ?

মানবীর পক্ষে এ কী করে সম্ভব ?
আমাদের দেখে তার কণ্ঠে রইলো না আর গান,
সলাজে পাশ কাটিয়ে হরিল মোর প্রাণ।
নন্দি বাবুকে বললাম গলাটা কী মিষ্টি
যেন স্বয়ং দার্জিলিং'এর সৃষ্টি।
ওর গান যদি আরও শুনতে পেতাম !

একটু পরই আবার সেই সুমিষ্ট কোকিল কণ্ঠের বোল।
জীপ চালককে জিজ্ঞেস করলাম
—ও কী গান গাইছে মাইলা ?
—চালক বললে—'তিব্বতী। তিব্বতী গান।
—ও কি তিব্বতী ?
—হ্যাঁ বাবুজী।
—ও গান' ত বরফের গান,
বরফের মাঝেও জাগায় প্রাণ।
—ঠিক বলেছেন বাবুজী।
—ও কী গান করছে ?

—মাইলারেপার গান। হাজার বছর আগের তিব্বতী কবি।

—আমরাও গাই।

—তাই ?

—হ্যাঁ। হতাশার মাঝে ফিরে পাই প্রাণ

—ও মেয়েটা গাইল যে গান

অর্থ কি তার ?

বাংলায় বুঝিয়ে বলবে ?

খুবই ভাল লাগবে।

বাংলা জান তুমি ?'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ ভাল জানে।

আগে ছিলাম যে বাগানে—

মেমসাহেব ছিলেন বাঙ্গালী।

স্বামী ম্যানেজার তিব্বতী।

কলকাতায় পড়তে পড়তে

ভালবাসায় মজে শেষ পর্যন্ত শাদী।

ও মেম সাহেব'এর থেকেই বাংলা শিখেছি।

—গাও না দেখি মেয়েটার গান।

—বরফের গান ?

—হ্যাঁ, বরফের মাঝে বরফের গান

বরফের কবি মাইলারেপার গান।

—ও, এ বাত ? তবে শুনুন।

গাইল গলাটা মন্দ না। তবে সুন্দরীর মতো নইক করুণ।

তুষার সঙ্গীত

শুভ্র তুষারের ভারি বর্ষণ যেন
দলে দলে উল ঝরে পড়া ;
শ্বেত বলাকা শাবক যেন
পাখা মেলা, ঝরে পড়ে ত্বরা ।

তুষার কণার হালকা বর্ষণ যেন
স্তরে স্তরে সাজানো টেকোর তাল,
ধীরে অতি ধীরে ঝরে যেন
ঘুরে ঘুরে শ্রমিক মাছির পাল ।

কখনো তারা ছোট, এতো ছোট,
যেন ক্ষুদে সরষের অগুন্তি সব দানা,
ঘুরে ঘুরে ঝরে, তারা যেন
সুতো কাটায় পেঁজো তুলোর হানা ।

শুভ্র তুষারের ক্লান্তি হীন বর্ষণ
পর্বত-শিখর যেন আকাশ ছোঁয়া,
শুভ্র তুষার কিরীট তার যেন
আকাশ নাগাল পাওয়া ।

ঝাপসা ধোঁয়াটে পাহাড়গুলো
বুঝি জন্মদিনে কোন শিশু,
সাদা ধব ধবে জামা পরেছে যেন
প্রত্যাশাও অনেক কিছু ।

সরোবর আর নদীনালা সব
বরফে বরফে একাকার,
কোনটা উঁচু কোনটা নীচু
বুঝে ওঠা খুব ভার ।

পৃথিবী হয়েছে বরফ সমতল
পাদপ আনত শিরে সাদা ওড়না,
নব বধূ সম সলাজে অচল,
পশুদের কিছু খাবারও জোটে না।

(২)

ছোট্ট হরিনী শিশু খাবার না পায় খুঁজে,
পাখা মেলা খেচর প্রাণীরা কাতরায়
ক্ষুধা তৃষ্ণায়,
চিকে ইদুঁরগুলো উষ্ণ গর্ত না পায়,
এ ভয়াবহ অবস্থায়
আমি মাইলারেপা—
সাথী তিন জন—ঃ
তুষার পাত প্রথম,
বাত্যাতাড়িত তুষার পিণ্ডের
দৃপ্ত তেজস্বি আক্রমণ,
সুতোর কাপড়খানা শেষতম।

তুষার পিণ্ড, শৈত্যতা নিঠুর হিমেল বায়
ঠেলে নিয়ে যায়
মৃত্যু পথযাত্রী আমায়।
জীবন রুখে দাঁড়ায়।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ বীরের মতো আপ্রাণ সংগ্রাম,
জীবনের জয়, জীবন ছিনিয়ে নিই
মৃত্যুর গহবর থেকে অবিরাম।
আমি বীর সন্ন্যাসী,
সাধনালব্ধ আত্মার আলোকে
পরাভূত করি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে—
মৃত্যু সম শৈত্যতার মুখোসধারী মৃত্যুকে।

সুতোর বসনখানা উড়িয়ে নিতে চায়
মৃত্যু সম নিষ্ঠুর শীতল খর বায়।
দৃপ্ত তেজীয়ান আত্মার বহ্নিবন্যায় ভেসে যাই
মৃত্যু-দূতকে ভ্রুকুটি দেখাই!

রক্ত মাংসের দেহটাইত নই,
আত্মাই' ত আমি,
আত্মা জরা মরণ রহিত পরমাত্মা স্বামী।
তাই, তুষার-দৈত্যের হিংস্র দংষ্ট্রাগ্র
অতল মুখ গহ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমি
স্মিতহাসা, আত্মতৃপ্ত!

(৩)

অচল-শিখর সম্রাট শুভ্রবরণ এভারেস্ট,
তোমারই শরণ-নিতে এলাম অবশেষ।
নিরালা শান্ত ধ্যানস্তিমিত তুমি মহাকাল
তব হৃদয়ে এসেছে হৃদয় আনন্দ উত্তাল।
হেথায় আপন মনে কানাকানি করে বসুধা ব্যোমে,
সৃষ্টির যতো কল কল্লোল হেথায় গেছে থেমে।

বিশ্ববিধুর শিরশোভন শুভ্র কিরীট যেন
আত্মহারা বিহ্বল রূপমুগ্ধ চিৎ মন।
ঘূর্ণি মলয়ে পাঠাও তুমি দূত করে
জল হাওয়া দুয়ে হাত হাত ধরে ওড়ে।
দখিনা বাবিধ তারি সাথে মেলায় তালে তাল,
চাঁদনি দিনমণির হয় তাতে হাতে বড়ার হাল।

অষ্টগ্রহ স্ব স্ব পথে শৃংখলিত যেন,
অস্পষ্ট ছায়াপথ আজি ক্ষীণ হয়েছে কেন?
ক্ষুদ্র তারাদের ঢেকেছে কুয়াশা যবনিকা,
স্বর্গ মর্ত্য গ্রাসিছে যেন অস্পষ্ট কুহেলিকা।
এরি মাঝে তুষার ঝরে দিবারাত্র নয়টা দিন,
তারি মাঝে বসে বসে সাধি সাধনা প্রবীণ।

(৪)

ধ্যানস্তিমিত শৈল শিখর উচ্চতম
আমি সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসাশ্রম ;
জনহীন প্রশান্ত ধ্যানমগ্ন অচল—
প্রকৃতি সৃষ্ট সাধক সাধন স্থল।
আমি যাব সেইখানে, গুরুর নির্দেশ
যদি মানি পাব জানি বিশ্ব-অন্তঃপ্রদেশ।

যদি গোপন রাখি তা হবে মহার্ঘ স্বর্ণ,
ভীত-শ্রদ্ধার পালনে হবো মহাবীর কর্ণ।
আমি সাধক, মানব সিংহ, আমি মহাবলী,
পরমানন্দে তিনটে শীত বনবাসী, আমি যে জংলী!

তিন নিদাঘ থেকেছি শ্বেত তুষারাবৃত গাত্রে,
তিন বসন্ত আনন্দে ছিলাম অত্যুচ্চ তৃণ-ক্ষ্যাত্রে।
তিন শরতে মেগেছি ভিক্ষে সর্বরকম,
গুরুর প্রসাদে আজি মুক্ত বিহঙ্গম।

আপন মনে গান গেয়ে যাই, আত্মার বন্দনাগীতি
নেপালী সুতো কুর্তা সম্বলিত দেহে নেই কোন ভীতি।
আমি আনন্দে থেকেছি, নন্দন-আনন্দে থাকি,
তোমরাও থাক আনন্দে থাক, আত্মবন্ধু থাকি!

(৫)

মৃত্যু সমন ভয়ে বেঁধেছিলাম ঘর
আজি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মম অন্তরতর।

ঘর মম অনন্ত সত্য—নিঃসীমতা
মৃত্যু ভয় দেখায় মোরে কার সে ক্ষমতা?

শৈত্য ভয়ে খুঁজেছিলাম উষ্ণ আচরণ
অন্তঃভাগের উষ্ণতাই মম সেই সে শোভন।

অভাব তাড়নায় এস্ত খুঁজেছিনু ধন,
প্রতিদানে বিশ্বচিত্ত পেয়েছি এখন।

জঠর জ্বালা চেয়েছিনু করিতে নির্বাপন,
সেই থেকে সত্য ধ্যান করিনু আপন।

তৃষ্ণা নিবারিতে আমি খুঁজিনু পানীয়,
সত্য-জ্ঞান-অমৃত সেই সে স্থানীয়।

ক্লান্তি অবসন্নতা ভয়ে খুঁজিনু বান্ধব,
প্রতিদানে অসীম শূন্যের স্বর্গীয় বৈভব।

(৬)

পৃথিবীটা মায়া মায়াময়।
জানি পার্থিব ভোগ সম্ভোগে
চিত্ত আবিল হয়।

তাই রূঢ় সত্য সন্ধানে রত
থেকেছি আমি,
দ্বেতর বাঁধন ছেড়ে করিয়াছি ব্রত
পরমাত্মা স্বামী।

শৈল প্রদেশে ঘুরে বেড়াই আদিম মানব,
বহিঃরূপ মায়াময় জানি, নই'ত দানব।
আপন মাঝারে আপনারে রাখি
ঈশ্বরই আমি হয়েছি নাকি ?

পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায়
একা ঘুরে বেড়াই,
মনকে পাব বলে আপন মনে
ঘুরি নির্জনতায়।

জ্ঞান শিশু লভিব বলে মহৎ প্রচেষ্টা চালাই,
জ্ঞান শিশু বক্ষে নিয়ে হৃদয়ে হৃদয় জুড়াই ;
দূরে, বহু দূরে মৃত্যুর পর পারেও দেখিতে পাই।
চলো রেচাঙ, তুমি আমি মিলে যাই
হিমালয়ের নির্জন তুষারাবৃত চূড়ায়।

পাপাচল সমুন্নত শির তুলে রাখে আকাশে
দুর্ভোগ-শিকারীরা সবে ঘুরে বেড়ায় সকাশে ;
শিকারী সারমেয় পাল সম সুখ সন্ধান চালায়।
পাপীরা সবে আজি বেলা অবেলায়
বিমলানন্দ বাঁধিবারে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়।
মৃত্যুর পরোয়ানা এসে যাবে জানে না তারা হায়,
চলো রেচাঙ, তুমি আমি মিলে যাই
হিমালয়ের নির্জন তুষারাবৃত চূড়ায়।

মায়াময় নশ্বর দেহের ফসিল পরে
মুহূর্ত দিবারা সবে বৃষ্টি হয়ে ঝরে,
বছর মাসে টুপটাপ রবে মুখরিত করে ;
পাপীরা তবুও অবিনশ্বর ভাবে দেহটারে
দেহক্ষয় রোধিবারে সাধ্য সাধনা করে।

ওরা মৃত্যুর ভাবিতে না চায়
চলো রেচাঙ, তুমি আমি মিলে যাই
হিমালয়ের নির্জন তুষারাবৃত চূড়ায়।

পার্থিব জলধির অতল দেশে
জ্ঞানশিশু সাঁতরায় আপন বেশে,
মায়া স্রোতের উল্টো সে পাশে
যাওয়াটা কষ্ট বড়ো, মনটারে কষে
তবুও যাব মহাকালের ক্ষয়হীন দেশে।

পাপীরা জানে না হায় কবে মৃত্যু এসে
নিয়ে যাবে যমালয়ের দারুণ তপ্ত ত্রাসে।
ওরা মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা ভাবিতে না চায়,
চলো রেচাঙ, তুমি আমি মিলে যাই
হিমালয়ের নির্জন তুষরাবৃত চূড়ায়।

(৭)

আমি সাধক, মানব মাঝে সিংহ পশুরাজ,
আমার মাঝারে বিজলীর ঝিক্‌মিক আর বজ্রের আওয়াজ।
সাধনার হিংস্র দংষ্টাগ্র আর থাবা
করায়ত্ত করেছি,
ভাবতন্ময়তার উষ্ণ পশম তোমাদের
বিছায়ে দিয়েছি।

পা রাখ যদি তুষারশুভ্র হিম-শিখর মাঝে
চমকে যেও না রাজ্যহীন রাজার নগ্নতার সাজে।

আমি সাধক, মানব মাঝে হিংস্র শার্দুল,
প্রাজ্ঞ মনের ত্রয়ী শক্তিতে পূর্ণ আকুল।

প্রাজ্ঞা পদ্ধতি দুয়ের হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত জানি,
বাস করেছি সাধন বনে শোনাতে অমর্ত্য বাণী।

আমি সাধক, মানব মাঝে মহাবলী বাজপাখী.
সৃষ্টির প্রোজ্জ্বল যজ্ঞকুণ্ডে পক্ষ বিছায়ে রাখি।

(৮)

যদিও আমি বংশ গৌরবে গরবিত নই
তবুও বলি আমি শ্বেত-সিংহীর ঔরসজাত,
মাতৃ জঠরে যবে নিয়েছিলাম থই

মনের ত্রয়ী-শক্তিতে পূর্ণতা পেয়েছি বলে খ্যাত
সদা পূর্ণ, সদা তৃপ্ত, নির্ভয়েতে রই।
শৈশবে কাটিয়েছি সিংহীর গুহায়,
যৌবনে তারই প্রবেশ পথে থেকেছি সতর্ক,

পূর্ণ মানব আমি শূণ্য হিম সাহারায়
ক'রেছি বিচরণ অকুতোভয় অসতর্ক,
শ্বেত সিংহীর ঔরসজাত তাই।

আপনারে বিহগ রাজ বাজপাখী তনয় বলি
যদিও বংশ গৌরবে গরবিত নই,
মাতৃজঠরেই গজিয়েছিল পাখাগুলি
শৈশবে আইরির বাস, আমি অমৃত তনয়।
যৌবনে প্রহরা দিয়েছি সে আইরির দ্বারে,
হাত বাড়িয়েছি পুরুষত্বে নভোান্তম প্রান্তে
যেথা সবাই বলে স্বর্গ আছে তার পরে ;
অনন্ত সে পথ, সাধ হয় তারে জানতে।

ত্রাস ভয় কাকে বলে জানিই না,
পৃথিবীর উপত্যকাগুলি যদিও অপরিসর
সন্ত্রাসে অন্তঃপ্রদেশ কম্পিত হয় না।
যদিও নাম না জানা তুষার পুষ্পে আমি,
ভীরুতা দুর্বলতা কভু আমায় সয় না।

(৯)

আমি সেই পরাযুগের নগর দেবতা মহামছলি সন্তান,
মাতৃ জঠরেই চক্ষু বিঘূর্ণিত করেছি,
যৌবনে নিয়েছি ভাজা মাছ সান্নিধ্যে নির্ভয়েতে স্থান।

মাতৃ জঠরেই জেগেছিল বিশ্বাস,
শৈশবে ধর্মনীতি দিত মনটান,
যৌবনে নিয়েছি গুরু পদতলে স্থান ;
আমি কারগুপ্তা গুরুর সন্তান
ধ্যানস্তিমিত পর্বত গুহায় নিয়েছি বাসস্থান।

দৈত্য দানব কতো চতুর্দিকে সন্ত্রাস জাগায়
লোমহর্ষক রক্তজলকরা বীভৎস দৃশ্য ছড়ায়,

ভূত প্রেত সবে কতো কায়া কতো মায়া ধরে
ধ্যানমগ্নতায় চিড় ধরাতে চায়—
কম্পিত নই, অকুতোভয়ে নিষ্কম্প, ধ্যানস্তিমিত রই,
আমি শ্বেত সিংহীর ঔরসজাত তাই।

যে সিংহী তুষার পরে অতীব চঞ্চল
শৈত্য কি পরাতে তারে আর পায়েতে শিকল ?
যদি তুষার রাজ্যের সিংহীর থাবায়
শৈত্য ফুটাতে পারে তার সূচাগ্র হুল
ত্রয়ী শক্তি পূর্ণতায় আত্মমগ্নতায়
হবে কি কেউ বিভোর আকুল ?

ঈগল স্বর্গের কাছাকাছি ওড়ে
নিঃসীম সীমার অনেক দূরে,
ভূমিতে পতন ঘটে কি তার কভু ?
যদি ভূতলে পড়িতে পারে
তবে দুটো শক্ত পক্ষের
কী ভূমিকা থাকিতে পারে ?

জলজ প্রাণী মৎস্য কি কভু
নিমজ্জিত হয় জলে ?
যদি তাই হয় প্রভু
এ ধরা যাবে রসাতলে।
আমি মিলারেপা ভয় করিনে ভূতে দৈতো,
যদি ভাই করে থাকি তবে
আত্মার ত্রয়ী শক্তিতে
বলীয়ান হবো কোন যুক্তিতে ?

(১০)

দূরে বহু দূরে স্বর্গ সন্নিকটে নীলাভ চাঁদোয়ার
কেন্দ্র বিন্দুতে শোভে দিন মণি নিশামণি,

অতুলনীয় দেবকান্তি তারা হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত
করে ধরাতল ; ধরাবক্ষে বয়ে যায় অপূর্ব লাবণী।

যবে চতুর্মহাদেশ পরিক্রমারত তারা ধরাবক্ষে
করে উর্বর পুলকিত, নরকে জোগায় খাদ্য পানীয় ;
অরি সেজে পথ মাঝে যেন না দাঁড়ায় রুখে
পুরাণ-কথিত লোকমতের 'গ্রহণ' যে রাহুর স্থানীয়।

হিম অচলের স্ফটিক স্বচ্ছ শিখর শিরে
গর্জনশীল শ্বেত সিংহীর অবাধ বিচরণ,
নিঃশঙ্ক চিত্তে বলা যায় তিনিই পশুরাজ,
রাজসিক মেজাজে মৃতদেহ তিনি করেন বর্জন।
যবে নীলাভ শ্লেটের চড়াই-কিনারা বেয়ে
রাজসিক স্থৈর্যে বীর্য প্রদর্শিত রেখে করেন অবতরণ
তুষার সমতল শুভ্র মখমল পরে,
তখন তারে তুষার ঝড় অরি সেজে না করুক বরণ।

দখিণা বনানীর পত্রপল্লব শোভিত চাঁদোয়ার নিম্নস্থ
আপনালয়ে থাকেন ডোরাকাটা বাঘ, মঙ্গল প্রতীক ;
শিকারী পশু মাঝে তিনিই সবার সেরা শ্রেষ্ঠ
স্বীয় মান সম্মান তরে জীবন পণ, এমনি বাতিক।
বিচরণ করুন তিনি অতল খাদে অপ্রশস্ত পথে।
কেউ মরণ ফাঁদে না ফেলুক তারে, অক্ষয় হোক মঙ্গল প্রতীক।

পশ্চিমে মাপামের নীলকান্ত মণি সরসি নীরে
বিচরণ করেন শুভ্র বক্ষাগ্রমাংস মৎস্য ;
সৃষ্টির আদি থেকেই তিনি জলভাগের নর্তকী,
যবে এখানে ওখানে খেয়ে বেড়ান চব্য চুষ্য
তারে না তুলুক টেনে শিকারীহাতের বড়শীটি।

উত্তরে দৈত্যকায় রক্ত পাথর ঊর্ধ্বে উড়ে গৃধ্র-
খেচর সম্রাট, শুভ সংকেতবাহী ;

পক্ষিকুল মাঝে তিনি ঋষি বিবেকবান অতি ;
আশ্চর্য বটে হরণ করেন না কভু কারও প্রাণ,
ত্রিশূল শিখরে যবে যিনি আহার্য সন্ধানে রত
কোন রজ্জু ফাঁদে তার না হোক প্রয়াণ।

(১১)

নিঃসীম শূন্য ধ্যানে যদি আনন্দ থাকে,
দীথিণা জলধ সৃষ্ট গগন যাদুতে ;
আকাশটাকে ধ্যান কর এটা মনে রেখে।

দিবাকর শশি ধ্যানে যদি আনন্দ থাকে,
দিবা শশির যাদু সৃষ্ট গ্রহ তারা সবে ;
দিবা শশি ধ্যান কর এটা মনে রেখে।

অচল রাজ ধ্যানে যদি আনন্দটা থাকে,
হিমালয়ে ধ্যান কর এটা মনে রেখে।

অনন্ত জলধি ধ্যানে যদি আনন্দ থাকে,
জলধি যাদুতে সৃষ্ট উর্মিমালা সবে ;
সাগরের ধ্যান কর এটা মনে রেখে।

স্বীয় মনে ধ্যান করে যদি আনন্দ পাও
মন মাঝে ধ্যান করে নিজেরে জাগাও।

(১২)

ধ্যান করবে যাও তবে নগধি ক্রোড়ে
ঋষিরা যেথা ধ্যান করেন যুগ যুগ ধরে।
যে মন্ত্র দীক্ষিত তুমি অনড় থেকো তাতে,
বিশ্বাসে যদি চিড় ধরে দেখো ও পর্বতে।
মনটারে করো তবে ও অচলের মতো
আপন মন্ত্র জপে যাও না হয়ে বিরত।

বন্ধুত্ব লভিবে যদি প্রার্থনা করি
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব থেকে আপনারে হরি
কুলু কুলু নদীটারে নাও হৃদে বরি।
ও নদী চলে চলে চলিতেই থাকে,
মাথা ঠুকে ঠুকে চলে কতোই সে বাঁক।
মনে মনে গেয়ে চলে সাগরের গীতি
সাগরে পড়িলে তবে তার যাত্রার ইতি।

আকাশটারে মনে করো আদর্শ তোমার
কেন্দ্র বৃত্ত নেই যার ভজন কর তার।
বিশ্ববিধির হৃদয় ঐ যে আকাশ
তারি মাঝে হোক তবে শাশ্বত প্রকাশ।
চন্দ্র সূর্য শোভে সবে বিশাল আকাশে
যমজ ভ্রাতা ভগ্নি সম থাকে পাশে পাশে।
তাদেরই মনে কর আদর্শ তোমার
দূর হবে তমসা যতো হৃদয়ে তোমার।

মহাসাগরের শান্তি ব্যাপ্তি ভরে দিক মন
বিশ্ববসুধা হবে তব একান্ত আপন।
ধ্যান কর ধাতব ধরাটা সামনেতে রেখে
স্বীয় মন-গ্রন্থ পড় যা প্রকৃতি লেখে।

(১১)

দেখছ'ত আমার হাতের এ দণ্ড !
শোনাই তবে এর আদি ও অন্ত—ঃ

ভারতীয় তরাইতে দাঁড়িয়েছিল মস্তক উন্নত,
শেষে ভারতীয় ছুরির কাছেই মস্তক নত।
দেখ তার গা'টা কী মসৃণ, তাও ভারতীয় হাতে,
বিশ্বগুরু ভারতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আমাতে।

দেখছ'ত আমার হাতের এই দণ্ড
সূমসৃণ পেলব ত্বকের পর্দা লাগানো,
এ বিশ্ব বাসীর হাতে সোহাগ দান যেন।

ভারত, ভারতীয় দর্শনের মূর্ত প্রতীক এ দণ্ড
আমি এ দণ্ড হাতে করি যতো শয়তান যজ্ঞ পণ্ড।

এই যে সরু বাঁশটা কাটা গেল মূলে
পৃথিবীর মূল কারণটাই যেন নেয়া হলো তুলে।

ঐ যে দণ্ডটার শৃঙ্গ গেল কাটা
সন্দেহবশতঃ ভুলের ইতি টানল ওটা।

দৈর্ঘ্য যে ওটার দু'হাতও নয়,
লোকপ্রিয় দ্বিত্ব ব্যবহার বর্জন তাইতে প্রমাণ হয়।

দণ্ডটার সহজাত সদাশয়তা আর নমনীয়তা
যেন আদিম মনের শাশ্বত উৎকর্ষতা।

তার রসমাধুর্য আর বর্ণ লাবণ্য
যেন শাশ্বত মনের উন্নতি অনন্য।

নমনশীল ঋজু বাঁশটা
বোঝায় নিশ্চিত সত্যের অভ্যেসটা।

বাঁশের ফাঁপা গুড়িটা
বোঝায় পবিত্রতা প্রবাহ পথের পরাকাষ্ঠা।

বাঁশের চারটে স্তর
বোঝায় অপরিমেয় পুণ্য উৎকৃষ্টতর।

বাঁশের তিনটে গ্রন্থি
বোঝায় ত্রি-দেহস্তর অবিনশ্বরতা বন্দী।

আর বাঁশের চিরসবুজ রঙটা
বোঝায় চির সত্যের অপরিবর্তনীয়তা।

তার প্রতিটা স্তরের গোলাকৃতি
বোঝায় সত্য সদা অপ্রতিরোধী।
তার চিরন্তন শুভ্র দীপ্তি
বোঝায় সত্য বস্তুর নিত্য উপস্থিতি।
বাঁশের ওপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগযুক্ত আঁখি
বোঝায় সুতী পোষাক পরিহিত তিব্বতী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি অন্তঃদর্শী
জন্মসূত্রে সম্ভ্রান্ত বাঁশটা
বোঝায় স্বীয় বিশ্বাস প্রচারে কর্তব্যনিষ্ঠা।
বাঁশটার মনোহর লাবণ্য
যেন মানব-বিশ্বাসের প্রতি আগ্রহ আবেগপূর্ণ।
বাঁশ পরেছে লোহার নাল
রাখিতে সন্ন্যাসীর পর্বতারোহণে তাল।
বাঁশের তামার হাতলটা
বোঝাই ব্যোমবিহারী দেবীর ঊর্ধ্বে মানব প্রতিষ্ঠা।
বাঁশের ওপর রয়েছে যে লোহার পেরেকগুলো
বোঝায় বড্ড অধ্যবসায়ী সন্ন্যাসীগুলো।
পরানো তাতে তামার যে আঙটা,
সন্ন্যাসী মনের চরম উৎকর্ষতা।
তাতে যুক্ত যে চর্ম চামাটি
বোঝায় সন্ন্যাসীর জ্ঞানগর্ভ নীতি।
তার রজ্জুর যে জরি দুটি
বোঝায় একের মাঝে দু'য়ের মিলন পথে সন্ন্যাস প্রগতি।
মূল রজ্জু সাথে সমরূপী রজ্জুর জড়াজড়ি
বোঝায় আদি ত্রি-দেহ আছে সাধু চিত্ত জুড়ি।
তার সাথে বদ্ধ রয়েছে যে শুষ্ক দাহ্য পদার্থ থলি
বোঝায় সর্বপ্রাণী তরে হয়েছে সাধুর বৃক্ষ্যাগ্রমাংস বলি।
তার সাথে বদ্ধ রয়েছে যে শুভ্র শঙ্খ-খোলা,
বোঝায় সাধু করিবে পবিত্র সত্য-নকশা অংকন খেলা।
যে ছোট্ট ব্যাঘ্রচর্ম সন্নিবিষ্ট তাতে
সাধুর সিদ্ধি বোঝায় ভয়হীনতাতে।

বুদ্ধ মূর্ত্তি

সামান্য একটা বাঁশ নিয়ে অসাধারণ কবিতা !
শুনতে শুনতে মাইলার পিঠ দিলাম চাপড়ে—
তার সুর মূর্চ্ছনা নিয়ে গিয়েছিল আমাকে
অচেনা তিব্বতের পাহাড়ে পর্ব্বতে
মনে মনে প্রণাম জানালাম বীর তেজস্বী সন্ন্যাসী
মাইলারেপাকে—তিব্বতী রবীন্দ্রনাথ।

'হ্যাঁ, সত্যিই, ভিন্নস্বাদের অসাধারণ কবিতা,
আমরা'ত সমতলের সাদা মাটা কবিতা
শুনতেই অভ্যস্ত। এ যে পাহাড় পর্বত-কাব্য,
পর্বতের মতোই শৌর্য বীর্যে গম্ভীর !
মুগ্ধ মোহিত নন্দীবাবু বললেন।

হঠাৎ, কেন যেন মনে হলো
সম্মুখে আমার চৈতন্যদেব, বিবেকানন্দ—
সুতোর তৈরী একখান রঙিন কাপড় পরিহিত,
হাতে উপরোক্ত বংশদণ্ড, চোখে হৃদয়—বিদারী
দৃষ্টি, মুখে মনমুগ্ধকর স্ফীত হাসি !
ভাবতে আনন্দ লাগে মাইলারেপার মতো
সাধক সৃষ্টিই শাশ্বত ভারতের কীর্তি।

অমর বাগ্মী বার্কের এজন্যই হয়তো
অক্লান্ত শাশ্বত ভারত প্রশস্তি :—
যে দেশেই যান না কেন ভারতীয়রা—
নির্বিচারে লুণ্ঠণ করেননি সে দেশ,
চালাননি লাগামহীন অত্যাচার ;
শাশ্বত জীবনচর্যা, মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের পরশে
সে দেশ বরং উজ্জীবিত, উদ্বোধিত জাগ্রত !'
একমাত্র ভারতবাসী আমিই এ গর্ব করতে পারি।

তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান
থাইল্যাণ্ড, কম্পুচিয়া, ভিয়েৎনাম, ফিলিপিন্স,
ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, মেক্সিকো পেরু পর্যন্ত
চিরভাস্বর চির অম্লান ভারতাত্মার পদতলে
নত জানু হয়ে বরণ করেছে অধ্যাত্ম-দীক্ষা,
সভ্য জীবন চর্যা।
ধন্য আমি ভারতবাসী, সার্থক জনম আমার !

'স্নো-ভিউর' সুখশয্যায় সুখ নিদ্রা ভাঙ্গে
বৃদ্ধ-মুণ্ডির সুমধুর তানে।
প্রতি স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতে বৃদ্ধ মুণ্ডির লম্বা
নম্র পদক্ষেপ, বামহস্তধৃত 'টঙ'এর আওয়াজ
ডান হাতে বাজাতে বাজাতে মুখরিত করেন
দার্জিলিঙ' এর পরিবেশ। স্বর্গীয় দৃশ্য,
সমাধিস্থ যোগীবর-আবেশ !

দূর থেকে শোনা যায় টঙের আওয়াজ।
টয়-ট্রেন স্টেশন দিক থেকে ভেসে আসে
শব্দটা—টঙ টঙ, টঙা টঙ—
উদীয়মান সূর্যের মতো অচিরেই বড়ো হয়।

একদা স্নো-ভিউ'র চার নম্বর ঘর থেকে
বেরিয়ে দেখি টঙ্ বাদকের অতীব সৌম্য দর্শন
মূর্তি—মুণ্ডিত মস্তক, শ্মশ্রুবিহীন—
দার্জিলিঙের কমলা লেবুর মতোই।
লম্বা চওড়া অবয়ব হিমালয়ের মতো গম্ভীর।
অতি ধীর প্রশস্ত পদক্ষেপ
প্রতি ক্ষেপে ফুটে যেন এক একটা পরিজাত।

হিলকার্ট রোডের দুপাশ থেকে শিশুরা সবে
বেরিয়ে আসে—হ্যামিলনের বংশীবাদকের
যাদু-সুর-আকৃষ্ট।

এক ঝাঁক রঙ বেরঙের প্রভাতী ফুলের হাসি
ফোটে রাস্তার দু'পাশে।
বুদ্ধ মুণ্ডি এখানে ওখানে তাদের সামনে
বিনম্র শ্রদ্ধায় দাঁড়ান এবং দাঁড়ান।
টঙ বাজনার তালে কি যেন এক মন্ত্র আওড়ান।

বুঝবার উপায় নেই।
তবুও ভালো লাগে অমৃতবর্ষিকণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ
—হৃদয়ে শীতল প্রলেপ,
স্বর্গ থেকে কোন দেবদূত এসে বুঝি দিয়ে যায়
এক ঝলক স্বর্গপরশ ; কামনা বাসনা পীড়িত
শুষ্ক হৃদয়ে যেন অমৃতবারি সিঞ্চন।
এ যেন ব্রাহ্ম মুহূর্তের সে কোন ফুলেল হাওয়া এসে
ফুটনোন্মুখ ফুলশিশু কুসুম কোড়কে হাসি
ঝলমলে করে দেয়া।

দোতলায় থাকে যে সব শিশুরা পারে না
বুদ্ধ মুণ্ডির পরশ পেতে। ছুটে আসে জানালার ধারে-
'এছাওয়া এছাওয়া কী যেন এক ডাক ছাড়ে।
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় বুদ্ধ মুণ্ডির।
রাস্তার দু'ধার থেকেই কচি কাঁচা চীৎকার।
মাটি থেকে আকাশে উঠে যায় সন্ন্যাসীর দৃষ্টি।
গৌর মুখের রঙিন ঠোঁটের স্মিত হাসি
সমেত মন্ত্রোচ্চারণ—যেন সাক্ষাৎ
পরম করুণাময় ঈশ্বরের পূজা।

শিশু ভোলানাথ করজোড়ে দাঁড়ায়।
পরম শ্রদ্ধাভরে বুদ্ধমুণ্ডির মন্ত্র আওড়ায়।
মন্ত্র শেষে গেরুয়াবসনা সন্ন্যেসী মাথা
নোয়ান আলতো করে—শ্রদ্ধা নিবেদনের এক
অননুকরণীয় কায়দা

কী যে আকর্ষণ এ নর-সন্ন্যাসীর !
অলি গলি বেয়ে পাতাল রাজ্য থেকে শিশুরা
সব উঠে আসে—বৃদ্ধ মুণ্ডির আশীর্বাদ নেবে।
করজোড়ে পরম ভক্তি ভরে দাঁড়ায় সামনে।
সব দেখে স্বর্গীয় আবেশে মুগ্ধ আমি ভাবি
এ যে ইহলোক নয়, অন্য লোক। এ লোকের
এতো শান্তি, এতো প্রশান্তি, এতো পবিত্রতা !
একটা লোকের এতোই ক্ষমতা !

শুধু শিশুরাই বা কেন ?
শিশু সুলভ চপলতাহীন বয়স্কদের কেউ কেউ
সামনে গিয়ে দাঁড়ান।
প্রণাম জানান সন্ন্যেসীকে।
আমাদের ঘোষদাও টঙের আওয়াজ শুনবেন
কখন, অপেক্ষায় থাকেন ! স্নো-ভিউ'র নীচে
রাস্তায় আনন্দবন্যা বয়ে যেতেই গিয়ে দাঁড়ান
সন্ন্যেসীর সামনে। করজোড়ে প্রণাম করেন তাঁকে।

সামান্য একটা টঙ, তার অলৌকিক সুর মূর্চ্ছনা।
যতক্ষণ শোনা যায় শুনি।
মনটাকে যে টেনে নিয়ে যেতে চান সন্ন্যেসী
যেন প্রচণ্ড একটা অজগরের নিশ্বাস তার চেহারায়, বাজনায়

আমার মনেও যে একজন সন্ন্যেসী থাকেন
যিনি উদাসী হাওয়ার মতো উদাস, ফুলের মতো
বিবাগী, প্রকৃতির সঙ্গে যার নাড়ীর টান—
—তারই মাঝে বিলিয়ে দিতে চান আপন অস্তিত্বটাকে।

রাস্তার মোড় ঘুরতেই অদৃশ্য সন্ন্যেসী।
কোথা যান তিনি, কী তার ঠিকানা ?
একদিন সন্ন্যেসীর অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও

স্নো ভিউ থেকে বাঁ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছি।
হঠাৎ দেখি উঠে যাচ্ছেন, উঠে যাচ্ছেন পাহাড়ের
বুক বেয়ে। ঈষৎ শোনা যাচ্ছে বাজনা।
পাঁচ দশ মিনিট।
উঠছেন' ত উঠছেনই।
ঋজু যুবা দেহটা সোজা উঠে যাচ্ছে ঊর্ধ্ব
শূন্যে পা দুটো বাড়িয়ে বাড়িয়ে—
যেন স্বর্গের পথটা তার জানা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেলেন মহাশূন্যে।
তবে কি রাবণের স্বর্গসিঁড়িটা এখানটায়?
ওটা বেয়ে বেয়ে কী সুন্দর স্বর্গে ওঠা যায়!

পরে জেনেছিলাম ঐ পাহাড়টায় রয়েছে এক
জাপানী প্যাগোডা। পাহাড়টা জলা পাহাড়
সমান উঁচু। জলা পাহাড় থেকে তিব্বতী চীনা
সীমান্ত অবধি প্রসারিত দৃষ্টি ভারতীয় নিরাপত্তার
অতন্দ্র প্রহরীদলের।
ওরা যান্ত্রিক চোখের দৃষ্টি পাঠায়।
টাইগার হিল বা বাঘপাহাড়েও রয়েছে
একই যান্ত্রিক দৃষ্টি।

মনে পড়ে সেই কিশোরীটাকে—
ফুটফুটে নেপালী ব্রাহ্মণ তনয়া –
যেন বৃষ্টি ধৌত সজীব গোলাপ।
স্নো ভিউ'র ঠিক নীচেই থাকে।
টঙ'এর আওয়াজ পেতেই বেরিয়ে আসে ঘর থেকে—
—পবিত্র দেবশিশু,
দেবতার পায়ে অতি পবিত্র পূজার্ঘ।
প্রতিদিন আসে প্রতিদিন একই সময়—
যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসে স্বর্গীয় পরশ।
কিসের আকর্ষণে ছুটে আসে?

অফুরন্ত ভক্তিধারার ফল্গুধারা তার মনে
বৃদ্ধমুণ্ডিকে দেয় উপহার।
বৃদ্ধ মুণ্ডিকে তার সামনে দাঁড়াতে দেখি
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে।
টঙের আওয়াজটা আরও মধুর হয়ে ওঠে,
মুখাবয়বের প্রশান্তি দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে।
পরম যত্নে মাথায় আলতো হাত রেখে
যতো শুভেচ্ছা রেখে যেতে দেখি
হৃদয়ের অতল দেশ থেকে।

ঐ বৃদ্ধ মুণ্ডি, ঐ ব্রাহ্মণ তনয়ার
চাষ পৃথিবীতে হতো যদি বেশি!
ওদের দর্শনে হিংসা ভুলে যেত পৃথিবী।
পবিত্র অন্তরে উপবিষ্ট হতেন শান্তি.
পবিত্র শান্তি, অতি দুর্লভ শান্তি!

তুষার রাজ্যে

মেঘলোক ঊর্ধ্বে তুষার রাজ্যেও গিয়েছিলাম।
যেন সে এক স্বপ্নের রাত।
দূর থেকে তুষার শৃঙ্গের হাতছানি,
অপরূপা কেদার উপত্যকার স্বর্গীয় বৈভব—
ডাঁয়ে বাঁয়ে সম্মুখে পেছনে চতুর্দিকে
শুধু তুষার আর তুষার,
সবুজের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই—
তুষার রাজ্যে আমি তুষার মানব,
রজত শুভ্রদেশ আমার ঠিকানা।

এ যেন কোন অলৌকিক কল্পদেশ—
যেন হীরক রাজার দেশেই আমি,
পাহাড় পর্বত আকাশ সবই হীরক খচিত।
এখানকার গানে যাদু আছে,
বায়ুতে মধু, আকাশে অপরীসীম মুক্তির উল্লাস।
হৃদয় এখানে বাঁধন হারা, উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা!

সে রজত শুভ্র শৈল শিখর মাঝে শুভ্র উপত্যকায়
মনটা যখন তখন উড়ে যায়
এতো আকর্ষণ তুষারের, এতো অফুরন্ত ভালবাসা তুষারের!

মৃত্যু দিয়ে কেনা এ স্মৃতি,
মনকে আবিষ্ট আপ্লুত করা স্মৃতি।
বদ্রীনাথ থেকে দেখেছি বসুধারার শ্বেত শুভ্র হাসি।

পুরাণবর্ণিত অনন্তকালের সেই বসুধারা—
ভাবতেই গায়ে শিহরণ জাগে!
ঐ পথেই যেতে হয় মানস সরোবরে, কৈলাসে।
সে'ত এখন চীন দেশে
ভারতবাসীদের নিষিদ্ধ দেশে।

কালিদাস তাঁর মেঘদূতে পাঠিয়েছিলেন সে দেশে।

সাদা অতি সাদা বরফ স্তূপে ঢাকা
অতি স্বচ্ছ নির্মল কাচ দিয়ে মোড়া
কৈলাস পর্বত গগনচুম্বী।
শত সহস্র শৃঙ্গ তার চিরতুষারাবৃত।
অতি সাদা খড়িমাটির গুঁড়ো মাখা
যেন মুখের মতো স্বচ্ছ এক আরশি,
সুরসুন্দরীরা সবে আনন নিরখি
সারেন প্রসাধন ক্রটি।
কুমুদের মতো শ্বেত শুভ্র বরণ বহুবিধ শৃঙ্গ
অসীম গগনের বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাপট জুড়ে,
কৈলাস নাথ নটরাজের নিত্য অট্টহাস্য
পুঞ্জিভূত রূপ যেন ঐ এক একটি শৃঙ্গ।

তুষার মানবের কথা কি সত্যি ?
মাইলেরেপার মতো সাধু সন্তদের কাছে
তুষার সে'ত অনুকূল পরিবেশ, মৃত্যুসম
শীতল'ত নয়।

শুনেছিলাম :—
জনা দশেক অভিযাত্রী যাচ্ছিল যমুনোত্রী।
পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত পা চলে না যেন।
তদুপরি কার্তিক মাসের তুষার ঝড়।
যেন মহাপ্রস্থানের পথ, সাক্ষাৎ যমালয়।

একজন সত্যি সত্যি ধরাশায়ী
ঝঞ্ঝায় উৎপাটিত বিটপি।
সঙ্গী সাথীরা কে কাকে বাঁচায় ?
মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে ব্যস্ত সবাই।

তবুও চেষ্টা ওরা না করেছে তা নয়।
'আমার জন্য কেন মরবি তোরা ?
চলে যা, চলে যা, প্রাণ নিয়ে বাঁচবি।
মৃত্যু সংবাদ'ত দিতে পারবি !'

অগত্যা, নয় বন্ধু তুষার ঝড়ের সঙ্গে
পাঞ্জা লড়ে বাড়ী ফিরতে পেরেছিল,
উঠে আসতে পেরেছিল মৃত্যুর অন্ধকার গহবর থেকে,
উচ্ছ্বল প্রাণময় আলোকে।

বাড়ী এসে হারানো বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ
—মৃত্যু সংবাদ' ত নয়,
প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণিবাত্যা,
সংসার কাননে প্রলয় তাণ্ডব।
কিছুদিন পর কায়াহীন কায়া নিয়ে
দেখা দিলে প্রিয়জনে।

কিন্তু বাসন্তি আমেজ ছিল না সে আগমনে,
ছিল বৈশাখী মেঘের শঙ্কা।
মৃত ব্যক্তির প্রাণ ফিরে পাওয়া
অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, কী সাংঘাতিক !

এক সন্ন্যেসী—তুষার মানবই ছিলেন
তার পরিত্রাতা।
কিন্তু, বরফের মতো জমাট শীতল দেহটা
সঞ্জীবিত হয়েছিল কোন সে যাদুতে !
মনে মনে বিরাট এক জিজ্ঞাসা,
কিন্তু, পেলে না কেউ উত্তর খুঁজে।

আমি অবশ্য উত্তরটা পেয়েছিলাম পরে।
এক সন্ন্যেসী বলছিলেন—বিবৃত করছিলেন
তার হিমালয় যাত্রার অভিজ্ঞতা :—

এক সন্ন্যেসী—হিমালয় যার দেশ।
বায়না ধরলাম যাব তার ডেরায়।
রাজি হন না কিছুতেই
আমরা থাকি চিরতুষার দেশে,
আমরা তুষার মানব।

সইতে পারবি না' ত তুষার কামড়।
ঘটবে তুষার সমাধি।

আমাকে নাছোর বান্দা দেখে রাজি হন
অবশেষে। মনের আনন্দে চললাম
ঠিকানাহীন দেশে,
তুষার মানবের দেশে।

তিন দিন পায়ে হাঁটা পথ প্রান্তে চিরতুষার দেশ,
প্রবল ঠাণ্ডায় রক্ত হিম হয়ে আসে
ঝরণা প্রবাহ রুদ্ধ, হিমবাহ।
আর পথ চলে না।
তুষার মানব হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেন।
মাটির দেশের বাইরে দুরন্ত তার গতিবেগ।
আমি যেন ঝড়ের পেছনে বিশুষ্ক পত্র পল্লব।

ফিরে তাকালেন হঠাৎ।
আমাকে জমে থাকতে দেখে বললেন :
মারা পড়বি? সময় হয়নি এখনো।
বাঁচাতেই হয় তোকে। চল ব্যাটা।
তুষার আর তুষার, বিশ্বটাই যেন তুষার-গড়া।

অবশেষে তুষার মানবের ডেরা—
ছোট্ট মন্দির। সামনে ভাসমান বরফের ডোবা।
কিছু একটা বুঝে ওঠার আগেই
ফেলে দিলেন ঠেলে—

কী নির্মম রসিকতা!
'বাঁচাও! বাঁচাও! আর্ত চীৎকার।

নিষ্প্রাণ দেহের ভাষা কোথায়?
'হো হো হো হো'—
তুষার মানবের আকাশ কাঁপানো হাসি।
তুষার গাত্রে তার ধ্বনি, প্রতিধ্বনি।
হাসতে হাসতে তুষারকুণ্ডে নেমে
কোলে তুলে নিলেন আমাকে—
যেন মায়ের কোলে রুগ্ন শিশু।

পরমাদরে বললেন—নে, খা।
শুয়ে থাক তুষার গাত্রে যতোক্ষণ খুশি।
খেতে না খেতেই গরমে শরীর অস্থির।
হাওয়া হাওয়া'ত নয়, যেন আগুনের হলকা।
যেন সূর্যের কাছাকাছি সে দেশ।

বাধ্য হলাম তুষার গাত্রে গড়া গড়ি দিতে।
আহা! উলের মতো নরম তুষার!
মখমলের মতো আরামী তুষার!
তন্বি রমণীর মতো লোভনীয় তুষার!

ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ পর ঘুম ভাঙ্গলো
ভীষণ ক্ষিদে, রাক্ষুসে খিদে।
বললাম—'বাবা, ভীষণ খিদে!'
—খাবি তুষার রাজ্যের খাবার?
এনে দেই তবে।

মুহূর্ত কয়েক পরে এলেন ফিরে।
টিকটিকি ডিমের মতো সাদা দেখতে
কিছুটা বড়ো অবশ্য আকারে
দিলেন খেতে আমাকে।

রাগ হলো তুষার মানবের পরে।
একী নিষ্করুণ রসিকতা !

'ভাবছিস কি ? চটপট খেয়ে ফ্যাল্ ।
তুষার মানবের খাবার ।'

কামড় একটা দিতেই রোমাঞ্চিত সর্বাঙ্গ—
দেব দুর্লভ অমৃতের স্বাদ।
বহুক্ষণ খিদে নেই।
যে কয়দিন ছিলাম কী পরমানন্দেই না
কাটিয়েছি তুষার রাজ্যে,
তুষার মানবের দেশে !

দেহে অগ্নিস্রাবি ফল,
খিদে মারা অমৃতস্বাদী ফল
এসবই তুষার রাজ্যে জন্মানো ফসল।
কী বিচিত্র রহস্য প্রকৃতির !
সন্তান বৎসলা প্রেমবিধুরা প্রকৃতি,
মানব সাথে তার চিত্তের যোগ, হৃদয় বন্ধন—
নাড়ির যোগ—মাতৃ জঠরে শিশু।
আমরা'ত প্রকৃতি জঠরেই লালিত শিশু।
প্রকৃতি আমাদের সুখে সুখী, আমাদের দুঃখে দুখীঃ।

শকুন্তলা যাবেন দুষ্যন্তের রাজপ্রাসাদে
সন্ন্যাসিনীর কোথায় বসন ভূষণ রাজরানীর ?
আশ্রমবাসী আবাল্য সহচরীরা চিন্তান্বিত—
কী করা যায়।
নির্বাক তরুরা সবে নীরবে ঝরিয়ে দিলে
মহার্ঘ সুদৃশ্য অলংকার,
ঝরিয়ে দিলে রঙ বেরঙের পোষাক ;

এবং অন্যান্য কতো কি প্রসাধনী দ্রব্য—
নারী রূপ লাবণ্য বৃদ্ধির সহায়ক।

মেঘদূতের অলকাপুরীর সেই কল্পতরুর
ছিল সুদৃশ্য জমকালো পোষাক দানের ক্ষমতা,
সে দানিত মদ্য, অলংকার, প্রসাধনী দ্রব্য—
এবং অন্যান্য মনোলোভা বস্তু সামগ্রী।

ঋষি সরভঙ্গ অনুপস্থিত।
অতিপ্রিয় তরু রাজির পরে অভ্যর্থনার ভার।
রাম এসেছেন রথে চড়ে,
ছায়া ফল পুষ্প দানে অতিথি সেবা
করলে বিটপি—পরম বিশ্বস্ত ঋষি বন্ধু।

কুমারসম্ভবে কবি কল্পনা ঃ
স্বর্গ থেকে অপ্সরীরা সবে অবতীর্ণা
হিমালয় বক্ষে,
পর্যাপ্ত খনিজ পদার্থ, ধাতব প্রসাধন লোভে।
পর্যাপ্ত বার্চ পত্র সুলভ হিমের আলয়ে
বিদ্যাধরীরা লেখেন প্রেমপত্র সিঁদুর হরফে।
বাঁশবনে গুহা নির্গত হাওয়া বয়ে যায়,
সৃষ্টি হয় সুরধ্বনি, যেন হিমালয়ের বংশিবাদন
তালে তালে কিন্নরী নূপুর ছন্দে।

তুষারাবৃত হিমালয় বক্ষে পদচারণারত
কিন্নর ললনা, তুষার কণ্টকে রক্ত-রক্তিম পায়ে
জোর কদমে চলিতে পারে না তারা,
ভারী তাদের স্তনযুগল পাছা।
রতি ক্রীড়ারত কিন্নরীরা লজ্জাশীলা
বসন খসাতে আড়ষ্ট। জলধমালা এসে সযত্নে
ঢেকে দেয় গুহাগহ্বর মুখ।

ঘোর অমানিশা রাতে অভিসারিকা দেখিতে
পায় না পথ, অমনি মেঘ এসে
নিয়ে যায় তারে শান্ত সে কুঞ্জ বনে
অচিরাভা অঙ্গুলির পথ নির্দেশে।

বিরহিনী যক্ষপ্রিয়া তরে বার্তা এনেছিল বয়ে
এই অভ্র, কালো সজল অভ্র,
বিরহ জাগানো বিরহিনী অভ্র।
নিরবিন্ধ্যা দেখায় তারে নাভিদেশ, যেন কমলা রঙ
ঘূর্ণিজল, তার প্রেমে হাবুডুবু খায় অব্দ—
আকাশের ঘনঘটা অব্দ, যেন এলোকেশির পিঠে
অমাবস্যা। শিপ্রার সমীর প্রেমোমত্ত প্রিয়া
সম চাহে তাকে আলিঙ্গিতে!
নদী সরোবর সবে সহস্র বাহু তুলে প্রেম বিহ্বল,
রমণীগণ সম রমণীয় প্রেম নিবেদিতে চাহে।

রঘুবংশের রাম বায়ুযান চড়ে যেতে যেতে
মুগ্ধ হয়ে যান মহামুনি অত্রির আশ্রম পরিবেশে
—শান্ত নিস্তব্ধ পবিত্র:
পশুরা সবে শান্ত, সর্ব রকম হিংসা ভুলে স্নিগ্ধ,
বায়ু বহে মৃদু মন্দ, তরুলতা সবে নিস্তব্ধ;
সবই যেন ধ্যান স্তিমিত মুনিদের মতো।

কুমার সম্ভবে শিব ধ্যানস্থ
প্রকৃতি পরিবেশের সজাগ দৃষ্টি যাতে
ধ্যান ভঙ্গ না হয় তাঁর; বৃক্ষ শ্রেণী অনড়;
গুঞ্জনহীন মৌমাছিরা; নেই বিহগ কূজন।
পশুদের দৌড় ঝাঁপ নেই। সবই শান্ত স্থিত
পটে আঁকা চিত্রার্পিতের মতো।

রামায়নের কবির কাছেও প্রকৃতি সমান সপ্রাণ সুপ্রিয়।
রাজ্যচ্যুত বনবাসযাত্রী রাম চিত্রকুট সন্নিহিত
মন্দাকিনী তীরে বিশ্রামরত।
চারিভিতে উদ্ভিন্ন যৌবনা যুবতীর মতো সুন্দরী
প্রকৃতির কামশরে বিদ্ধ ভূ-পতি রাম।
রাজ্য গেছে দুঃখ নেই। অপূর্ব সুন্দর পর্বত শোভায়
মুগ্ধচিত্ত তাঁর। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়
কতো পাখী—কাকলি রবে মুখরিত চতুর্দিশ।
তামাটে চূড়োগুলো চুম্ব মারিতে চাহে নীলাম্বরে,
কভু রূপালী আভায় রূপ পাল্টায় ;
কভু রক্তিমাভ, হলদে, কিংবা লালে লাল ;
এ মুহূর্তে পোখরাজ, পরমুহূর্তে স্ফটিক স্বচ্ছ,
কিংবা কেতক কুসুমকলির মতো শুভ্র।

মনোমুগ্ধকর অরণ্য ছায়ায় কতো ছায়া প্রচ্ছায়া,
কতো কলি, কতো কাকলি,
কতো প্রস্ফুটিত পুষ্প ফল মূল।
দেখ, দেখ, চূড়ায় চূড়ায় প্রেমোমত্ত কিন্নর কিন্নরীরা,
বিটপি ভুজে ঝুলিছে তাদের অশনি, ভূষণ।
অপূর্ব সুন্দর সাজানো গোছানো উপত্যকায়
বিদ্যাধরী ললনারা ক্রীড়ারত।
অগুন্তি ঝরণা স্রোতস্বতী ধারা সমৃদ্ধ অদ্রি
যেন যৌন উত্তেজনা বিদ্ধ হস্তী।
মৃদু মন্দ সমীরণ বয়ে নিয়ে আসে কুসুম গন্ধ
সুবাসিত প্রাণে জাগে অপার আনন্দ।
ঐ যে, অচ্ছোদ মন্দাকিনী অপগা প্রবহমানা
—অতিজব সলিলধারা।
সে সলিলে পড়ে বিহগছায়া, তীরে তার কতো
পুষ্পের হাসি, কতো পুষ্প স্রোতে যায় ভাসি ;
দু' তীরে কতো পক্ষী, কতো অঙ্ঘ্রিপ লতিকা।
মন্দাকিনী—যেন কুবের দেশের নলিনী।

বাঁকে বাঁকে মনোলোভা ঘাট, পশুকুল ভীড় করে
তৃষা মেটাবার তরে,
অংপাতি অব্ধিকফ ফণা সম হৃদয় উদ্বেল হয়ে
উঠে যবে দেখি বৃক্ষ বল্কল পরিহিত ঋষিরা সবে
পুণ্য স্নান সারে তার পূত পবিত্র জলে।
মহাজ্ঞানী পুণ্যাত্মারা সে স্নিগ্ধ পূত প্রভাতে
সিক্ত দেহ মনে করজোড়ে সারেন সূর্যদেব স্তুতি।
সমীর প্রকম্পিত অটতধারী চিত্রকূট
যেন নেচে নেচে চলে দু' তীর ধরে অতিঘপরূপ।

অগুন্তি কচি কাঁচা পত্র পল্লব, সোনালী রূপালী পুষ্প
ঝরায় মন্দাকিনী স্রোতে।
রূপমুগ্ধ চক্রবাক মধুর তানে মুখরিত,
উড়ে বেড়ায় স্রোত ঊর্ধ্বে।
আহা। দুটো অব্জ অব্জিনী মাঝে ডুব দেয়া
স্বর্গীয় অনুভূতি, স্বর্গীয় বিভূতি!
ভাই লক্ষ্মণ, আমি মন্দাকিনী জলে দেখতে
পাচ্ছি সীতাকে ; অযোধ্যাবাসীদের পশুদের মাঝে ;
অযোধ্যাকে পর্বত দেশে—
নির্ধারিত হোক এখানেই ভাগ্য আমার!
পবিত্র স্নান সারিব মন্দাকিনী জলে,
খাব ফলমূল, তোমাদের সান্নিধ্যে
এটাই হোক আমার অযোধ্যা, আমার রাজত্ব।

চা-বাগানের পথে

'এসে গেছে, নাবুন এবার।'
কে ! হাজার হাজার বছর পেরিয়ে এসে
বললাম-কে ! ও, নন্দি বাবু !
'হ্যাঁ নাবুন। ঘুমোচ্ছিলেন ?
না, মানে—চোখ খুলতেই দেখি
অপূর্ব শোভায় সুশোভিত রূপ বর্ণে আনন্দিত
সে এক নন্দন উপত্যকা। আমি বনবাসী রাম ?
মহাঋষি কর্ণের আশ্রমে দুষ্যন্ত ?
কী সৌভাগ্যবান আমি !
দার্জিলিং শহরের পরিধি ছেড়ে এতগুলো
অনুপম উপত্যকায়—যেন স্বর্গীয় উদ্যানে
বেড়াচ্ছি ঘুরে। রূপবতী দার্জিলিং'এর রূপলাবণ্য
ফিকে হয়ে আসছে, নিত্য নূতন ঘরবাড়ী
লোকজন দোকান পাট প্রকৃতিকে বঞ্চিত
করছে ক্রমশঃ তার যৌবন থেকে, রূপলাবণ্য
থেকে। স্পষ্ট বোঝা যায় এসব মনোমুগ্ধকর
উপত্যকায় এলে।

দুঃখ হয় সেই সব প্রকৃতিপ্রেমী
ভ্রমণ বিলাসীদের তরে যারা বেরিয়েছে ঘর ছেড়ে
প্রকৃতির কোলে নিশ্চিত সুখী বিশ্রাম,
অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে হাস্যে লাস্যে
ভাসিয়ে দেবে নিজেদের—
এসব পাবে তারা দার্জিলিং শহরে ?
আসতে হবে এসব উপত্যকায়
চা বাগানের সবুজ সমারোহে, আন্তরিক আতিথেয়তায়।

তবেই বুঝবে স্বর্গরূপ আসলে সে কী,
স্বর্গ বলে কাকে, উদ্ভিন্ন যৌবনা প্রকৃতির আসল স্বরূপ ;

মনকে রাঙিয়ে দিতে পারে কোন রঙে, উচ্ছলিত
করিতে পারে কী আনন্দে, কোন সুগভীর পরিতৃপ্তির
সিংহাসনে বসাতে পারে বাদশাহী মেজাজে।
কিন্তু কোথা পাবে তারা এ সুযোগ, দেবদুর্লভ
এ সুযোগ যেমনটি আমাদের।

হরিয়ানা থেকে আগত চা-ম্যানেজারের
সঙ্গে আলাপ হতেই শুধালাম—
সেই দূরদেশ থেকে এলেন এখানে। কোন সূত্রে?'
'হিন্দি ছায়াছবির মহব্বতে।'
ছবির প্রেক্ষাপট দার্জিলিং'এর চা-বাগান।
চা-বাগান' ত নয়, যেন ভূ-স্বর্গ!
প্রতিজ্ঞা করলাম যাবই যাব ওখানে।
অকৈতব সবুজাভা, অঞ্জসা অটবি, এতো অচ্ছ
অংশুল, অদ্যশীনা অদ্রি অনবাহ অনস্তায়।
অপ্রতিম রূপমুগ্ধ আমি দেখতে পাচ্ছি
দুটো পাতা একটা কুঁড়িতে বাঁধা পড়ে গেছে আমার নিয়তি।

—আপনি সুখী?
—খুশি, আমি খু-উ-ব খুশি।
লেবঙ রেস কোর্সের মাঠে আষাঢ়ের মেঘ
সম তেজস্বী অশ্ব ছোটে—
অশ্বারোহীর উষ্ণ রক্ত, যেন গ্যাস বেলুন।
চতুর্দিকে হৈ হুল্লোর চীৎকার
বাজি জেতার অপার আনন্দ উল্লাস,
সক্রিয় ভূমিকা নেন পঞ্চনদীর উদ্দাম যৌবন প্রতীক
অরোরা সাহেব।

নিদর্শন তার দেখেছি অশ্বাবলে—মহাকাশ তরে
অপেক্ষমান মহাকাশযান সম তরতাজা উদ্দীপ্ত তেজি।

অশ্বারোহী অরোরা ছোটেন, দার্জিলিং'এ
উত্তেজনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে বাজি জেতেন,
দিবাশেষে আলয়ে ফেরেন সময় বিজয়ী সৈনিক।
প্রকৃতির শ্যামক্রোড়ে বিধৃত অস্তিত্ব তার,
ভাজা চা'র মিষ্ট গন্ধ, চাপারাঙা উদ্ভিন্ন যৌবনা
মহিলা শ্রমিকের মুখর লাস্যময় জীবনে ভরা ;
নেশাধরা গরম পানীয়ে উদ্দাম উছল।
দাস দাসী পরিবৃত ফুল ফলে উদ্ভাসিত
বাঙ্গলো তার, যেন অতীতের কোন
দেশীয় রাজের জমকালো রাজপ্রাসাদ।
সাজানো গোছানো এক একটা চা বাগান
লালন করে কয়েক'শ থেকে কয়েক হাজার শ্রমিক।
চা যাদের জীবন মরণ।
এক একটা চা বাগান—এক একটা গ্রাম দূরে দূরে।
একটার সঙ্গে অন্যটার বৈবাহিক সম্বন্ধ, আত্মিয়তা।
এক চা বাগানে দেখেছিলাম ফুলদলে লতা পাতায়
সুসজ্জিত বাষ্পচালিত বৃহৎ যানে চড়ে
রঙ বেরঙের পোষাক পরা বরযাত্রীর দল অপেক্ষারত
যেন হৈমন্তিত ক্ষেত্রে ফসলে ফসলের ঢেউ।

কোন কোন চা বাগান দার্জিলিং শহর থেকে
আড়াই তিন হাজার ফুট নীচে।
যা রাস্তা ! পাথর বাঁধানো এবরো খেবরো রাস্তা
সোজা নেবে গেছে উড্ডীয়মান ঘুড়ির ডোরের মতো।
একটা বল ফেললে নেবে যাবে দ্রুত
দুরন্ত জীপটাকেও হার মানাবে।
আমাদের অনেকেই তাই বাগানে নাবতে চায়নি ভয়ে।

ক্রোধান্ধ বন্য মোষের মতো কানে তালা লাগানো
গোঁ গোঁ শব্দে জীপটা নাবছিল—

মুখ থুবড়ে আঙ্গুল টিপে টিপে নামতে নামতে
হঠাৎ রেলগাড়ীর মতো বাঁক নেয়।
গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে মৃত্যু ভয়ে।
এক তিল হেরফের মানেই মৃত্যু, সাক্ষাৎ মৃত্যু !
একটু আগে চালক দেখিয়েছিল নীচে
বৃক্ষশাখায় ঝুলছে কাপড়—পত্ পত্ করে
উড়ছিল উদাস হাওয়ায়।
ব্যাপার কী ? দুর্ঘটনার শিকার। নিরীহ শিকার
তলিয়ে গেছে কোন অতলে, পায়নি মৃতদেহের
সন্ধান। শুনে একটা শিহরণ জাগে দেহ মনে।
মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে যাচ্ছি।

সিনহা জিপের পেছনে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে,
জিপ্‌টা বেছে নেয় যদি রসাতলের পথ
ছত্রী সেনার মতো দেবে ঝাঁপ, বাঁচাবে নিজেকে।
রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখখানা করুণ মায়াময়—
বসন্তে ঝরাপাতা।
নন্দী সেনগুপ্ত'র ত আরও ভয়।
অতো ভয়াবহ রাস্তা ধরে নামবেই না নীচে।
কতো বাগানের শ্রীময়ী রূপ, নন্দন কানন-প্রভা
বঞ্চিত হয়েছি এভাবে—
ক্ষোভ হয় কতগুলো দুর্বল নীরস মরু মন
করেছে আমায় স্বর্গসুধা বঞ্চিত !

এক একটা চা বাগান এক একটা উপত্যকায়
স্বর্গরূপকেও যে হার মানায়,
প্রকৃতি ওখানে সুয়োরানীর মতো উচ্ছলা সুখী।
স্বর্গ ভ্রমণ সুযোগ বার বার' ত আসে না,
একবারই এসেছিল।
তাই আমি এখনো বঞ্চিত, অতৃপ্ত
পারিনে ক্ষমিতে দেহসর্বস্ব দুর্বলচেতা ওদের।

পোঁ ওঁ ওঁ শব্দে জীপটা নামে, বেশ লাগে,
সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মতো টাল মাটাল অবস্থা ;
তবুও ভাল লাগে—অভিযানের আনন্দ,
ডিঙ্গি নৌকোয় সাগর পাড়ির আনন্দ।
বারে বারে মনে পড়ছিল ঈশ্বরকে,
তাঁকেই যেন প্রত্যক্ষ দেখছিলাম—
দৈনন্দিন জীবনের একঘেঁয়েমির বাইরে না এলে
যাঁকে উপলব্ধি করা যায় না,
আকাশে বাতাসে প্রকৃতির মাঝে মিশে আছেন
যিনি সেই চিৎ আনন্দ'র অনুভূতি জাগে না।

মনের ভয়টা ছিল নীলাকাশে মিশে যাওয়া
চিলের মতো। রসাতলে যায় যদি যাক না
জীপটা, নাদুস নুদুস সুন্দর দেহটা হোক না
তবে মাংসপিণ্ড—জীবনটা না হয় হলো সুন্দরের পায়ে বলি।
সুন্দরকে যেখানে পরাভূত করে ভয় শঙ্কা
সেখানে থাকে কি বাঁচার আনন্দ ;
ভূমার সঙ্গে যোগ যেখানে, মৃত্যু ভয় থাকে কি সেথা ?

সহযাত্রীদের কী করে বোঝাই কথাটা !
ভাল পরাটা খাওয়াটা বাদে জীবনে কি অন্য
কিছু নেই ? প্রকৃতির উন্মত্ত নগ্ন সৌন্দর্যের
লীলাভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়েও যে ওরা
কল্পনা করে নারীর নগ্ন সৌন্দর্য, মুরগীর ঠ্যাং !
দেহবদ্ধ মাংসাশী জীবন, মৃত্যুর হাতছানি দেখবেই।

মৃত্যুকে সহজ সরল আনন্দময় করে নেবার
মতো বাস্তব বুদ্ধি ওদের কোথায় ? সুবিধেবাদী।
আলোকেই শুধু স্বীকার করে—অন্ধকারের
কোন ভূমিকা অস্তিত্বই বুঝি নেই।
সুখকে এতো বেশি কামনা করে
দুঃখ এলে তাকে ভাবে অপাংক্তেয়,
ভূত দেখার মতো।

অর্থ বিত্ত ওদের আমার থেকে অনেক বেশি।
তবুও মায়া হয় ওদের জন্য।
আত্মাকেই যদি না গেল কেনা,
কী হবে পৃথিবীর অর্থ বিত্ত নিয়ে !

ওরা অসহায়, জীবনযুদ্ধে হার মানা সৈনিক।
ঈশ্বর—সর্ববিধ জীবনের যিনি উৎস
তিনি' ত অন্ধকারেও আছেন, মৃত্যুতেও তিনি—
সর্বব্যাপী তাঁকে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও' ত পাব !
ঠিক সেই মুহূর্তে উপনিষদের ঋষি যেন
কানে কানে বলতো: মাভৈঃ,
যেন প্রেয়সীর অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ থেকে
উঠে আসা হৃদয় প্রশান্ত করা কোন বারতা।

মেঘ, দাও মানসীর সন্ধান !

দার্জিলিং আমাকে টানে।
ফুল ফল সরলবর্গীয় বৃক্ষ ললনা সুন্দরী
এক একটা স্বর্গোপম উপত্যকা কুমারী রূপবতী,
ধোঁয়া ধোঁয়া, নরম নরম বাষ্পীয় মেঘের অস্তিত্ব
ডোবানো সোহাগ কী করে যে ভুলি !

ঐ মেঘ কি বয়ে নিয়ে এসেছিল প্রেয়সী সোহাগ,
কোন বারতা কি এনেছিল বয়ে
মানসীর একান্ত বিশ্বস্ত সংবাদ বাহক ?
কোথায় বন্দী হয়ে মানসী আমার,
কোথায় বন্দিনী সেজে ডাকিছে মানস প্রতীমা ?
দার্জিলিং' এর মেঘ জানতো কি ঠিকানা তার ?

কিছু একটা বলতে সে চেয়েছিল—
কেন যে শ্রবণ সাধনা করিনি ?

মেঘের নীরব ভাষা শুনতে হয় হৃদয় দিয়ে,
হৃদয়ের ভাষা হৃদয়ই যে বোঝে।
দার্জিলিং'এর মেঘ হয়তো দেখেছিল
আমার মানসীকে—আমার মনের তিল তিল
মাধুরীগড়া তিলোত্তমা।

চিনিতে কি পারিনি তাকে?
কোচিন, ত্রিবান্দ্রম কন্যাকুমারী রামেশ্বরম
চিল্কা বালেশ্বর হয়ে বঙ্গ, ভারত, আরব বারিধি
থেকে উড়ে আসা মেঘ'ত দেখেছিল কতো রূপবতী যুবতী।
তাদের কেউ না কেউ ছিল আমার মানসী।
তাদের কেউ কন্যাকুমারীর উচ্ছল দুর্বার
মত্তহস্তী সম ত্রয়ী সাগরের মিলন স্থলের
কিনারে বসে উন্মনা চিত্তে ভাবছিল—

ভাবছিল কি তার মানসপুত্র হৃদয় সরসিপদ্ম
আমারই কথা?
পেতে চাইছিল আমারই সন্ধান?

তেজি অশ্বসম ঘন কালো মেঘকর্ণে ফুঁকে
দিয়েছিল কি কোন বারতা আমারই তরে?
আমাকেই যে সে ফিরছিল খুঁজে মুক্ত
আকাশের নীচে একমাত্র অস্তিত্ব মেঘে মেঘে,
ধরাবক্ষে স্তব্ধ নীলাভ গম্ভীর ধ্যানস্তিমিত
সায়র সন্ন্যাসী বক্ষে।

কন্যাকুমারী গিয়েছি।
হয়তো দেখেওছিলাম বিশ্বের সৌন্দর্য প্রতীমাকে—
নিজেকে হারিয়েছিল যে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে,
নাকি আমারই মাঝে?
তার মাঝে দেখেছিলাম সাগর ব্যাপ্তি,
মহাকাশের মুক্তি,
লক্ষফনা তোলা উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ের প্রাপ্তি!

তারে দেখে দেখে আমিও যেন সাধক বনেছিলাম—
নগাধিরাজের মতো অনড় অচল সমুন্নত,
মনকে করেছিল আনত ;
কোন অসতর্ক মুহূর্তে লুপ্ত অস্তিত্ব হয়তো
বলে উঠেছিল, 'মানসী' ! মানসী !'
বুঝি উল্লাসে ঝাঁপিয়েই পড়ে বুকে।
সঙ্গে সঙ্গে লাগাম টেনেছিলাম-'সর্বনাশ !'
ও'ত মানসী নয়, তার ছায়া মাত্র।

ও'ত যথার্থ ছায়া নয়, কিংবা কোন
গোলাপ অথবা পারিজাত
যে সৌন্দর্যবিলাসী প্রেমাসক্ত মনের আকুতি
সহ্য হবে তার।
মূক প্রকৃতিকে নিয়ে যা খুশি ভাবতে পারি—
গড়তে পারি ভাঙ্গতে পারি ;
কিংবা কোন সুপুরুষ জন্তু কিংবা পাখী
ধরতে পারি, ধরাতে পারি, জানতে পারি
জানাতে পারি—যেভাবেই খুশি।

দার্জিলিং যেন অলকাপুরি।
মানসীর খোঁজেই বুঝি গিয়েছিলাম অলকায়
একই সঙ্গে ছয়ঋতুর পুষ্পবীথি যেথা।
অলকাবাসিনী যক্ষিনীদের অঙ্গে সজ্জা হয়ে
ঘুরে বেড়ায় অমল পূত সুগন্ধী শুভ্র কুসুম রাজি।

হস্তে সদা বিধৃত পদ্মফুল—
হস্ত সঞ্চালনের তালে তালে
পার্থিব আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে অগুন্তি কমল।
কুন্তলধামে ঝুলে কুন্দকুসুম লহর ;
হংসারুঢ় শুভ্রার মতো শ্বেতা মুখশ্রী
গড়ে অমল ধবল লোধ্র কুসুম পরাগ।
শৈত্য পারে না হুল ফুটাতে চন্দ্রাননে।

করবীর দু'পাশে শোভে সদ্য প্রস্ফুটিত কুরুবক,
অতি পাতলা শ্বেত পাপড়ি গুচ্ছ ফুরফুরে
উড়ে ভ্রমরকৃষ্ণ কবরীর দু'পাশে।
কী অপূর্ব সুন্দর !
দু'কর্ণে দুই শিরীষ পুষ্প,
হার মানে জড়োয়ার অবতংস ;
সীঁথির মুখে ললাট ঊর্ধ্বে ফুটন্ত কদম কুসুম
দু'পাশের দু'গোছা সরু কুন্তল রজ্জুতে বাঁধা।

সেথা সদা ফুল ফোটে
মধুলোভী ভোমরা উড়ে উড়ে ফুলে ফুলে
গুন গুন গায়।
সেথা মৃণালিনীতে সদা পুষ্প ফুটে,
চতুর্দিকে বৃত্ত রচনা করে কলধ্বনিমুখর হংসমালা।
যেন নলিনী সুন্দরীরা পরেছে চন্দ্রকান্ত মণির
চন্দ্রহার, ঐ যে শোনা যায় তার
অব্যক্ত মধুর শিঞ্জা।
সেথা গৃহময়ূরগুলোর কলাপ সদা
সহস্র চন্দ্রক পরে দীপ্তি পায়
বর্ষা মেঘের অপেক্ষা না রেখেই।
দিগন্ত মুখরিত হয় কেকা রবে তাদেরই।

কতো রঙ বেরঙের ফুল রয়েছে ছড়িয়ে,
অমল ধবল প্রাসাদের চন্দ্রকান্ত মণি নির্মিত
কুট্টিমে— যেন ঊর্ধ্বে নীলিমা থেকে
রাশি রাশি তারা সবে এসেছে নেমে।
যেথা যক্ষগণ অনন্ত রূপ যৌবন শালিনী
কামিনী সান্নিধ্যে মধুপানরত—পুষ্প মধু ?
নহে। কল্পতরুর।

দেবতাবরেণ্যা যক্ষকন্যারা সবে মন্দাকিনীর
স্বর্ণরেণুবৎ বালুপূর্ণ চড়ায় ক্রীড়ারত—

'খুঁজি খুঁজি নারি, যে পাবে তারি'—
মণি নিয়ে মণি মেলার খেলা।
চাঁদের আলোকগড়া যক্ষ কিশোরীবালা!
অতো পরিশ্রম সহ্যও যে কী করে হয়!
হবে নাইবা কেন?
তারা যে মন্দাকিনীর সলিল শীকর সিক্ত,
সুশীতল সমীরণ করে সবল স্নিগ্ধ,
তটস্থিত মন্দার তরুরাজির ছায়ায় রৌদ্রতাপ নিবারিত।

শুভ্র প্রভাতে দিন মণি যবে মধুর পরশে
ডাক দিয়ে যায়, জেগে ওঠার ডাক,
পথ ঘাটগুলো যেন চমকিয়ে ওঠে—
'আরে' এযে মন্দার কুসুম,
রাতে বেরিয়েছিল যখিনীরা অভিসারে,
ক্ষিপ্রচরণে দ্রুতগতি নিবন্ধন কুন্তলগুচ্ছ শোভাচ্যুত।
ঐ যে কর্ণদুল—কর্ণস্বর্ণকমল,
পীবর স্তনসজ্জা মুক্তার জাল আর কণ্ঠহার
পীন পয়োধরে ছিল দুর্বার,
দোলনে দোলনে টান খেয়ে অবশেষে পথাশ্রিত।
কল্পতরুর দেশে বাসনা কি কারও অপূর্ণ থাকে?
বাসনা জাগলেই হয়।
রসরঙ্গিনী যক্ষললনা সজ্জার সর্ব উপকরণ
জোগায় রসিক রাজ কল্পবৃক্ষ।
কল্পপাদপ তলে আনত শিরে দাঁড়াতেই
তারা পায় কলহংসচিত্রিত
নয়ন রঞ্জন বসন, সদ্য ফোটা পারিজাত, কচি পত্রপল্লব,
নানাবিধ হীরে জহরত অলংকার,
অনুপম চরণ কমলে যা মানায় তাও।
সুপেয় মদ্য নয়নে আননে কতো কি যে ভাব ভঙ্গি
এনে দেয় কল্পবৃক্ষ তাতেও সজাগ।

কুবেরের আলয় কোথায়?

তার উত্তরেই' ত যক্ষের শান্তির নীড়—
ইন্দ্রধনুর শোভা।
আঙ্গিনার এক ধারে একটি ছোট্ট মন্দার
কচি কচি পত্রপল্লব ভারে আনত
হাত বাড়ালেই পল্লব মাতৃ স্তন সম স্নিগ্ধ।
ভেতরে বড়ো দীঘি—শান বাঁধানো ঘাট,
টল টলে নীল বক্ষে স্বর্ণপদ্ম আধফোটা—
মৃণাল সুনীল বৈদুর্যমণির আধার।

মানস সরোবর? ঐ'ত কাছেই।
তবুও কেন যে হংসপাল দীঘি ছেড়ে যায় না সেথা,
মম প্রেয়সীর বাত্যাতাড়িত দেহবল্লরী সদা
নয়ন গোচরে রেখে তারা কি সুখাচার বিস্মৃত?

ঐ যে ছোট্ট ক্রীড়া পর্বত।
প্রেয়সী সনে কপোত কপোতী সম
কতো কি যে কথা, কতো কি যে ভান,
কতো ছোটাছুটি, হুল্লোর হুজ্জোতি!
আবার কি ফিরে পাব অমৃত মধুর সেই দিন?
ক্রীড়া পর্বত সান্নিধ্যে মাধবীলতাকুঞ্জে
কুরুবক বৃক্ষের আড়াল দিয়ে ঘেরা অশোকবন—
পাশেই অশোক বকুল—যমজ বোন।
মাঝখানে একটি স্বর্ণযষ্টি—
নিম্নাঙ্গ তরুণ পত্রপল্লব সম চকচকে সবুজ,
তদূর্ধ্বে শোভে স্বচ্ছ স্ফটিকনির্মিত মনোরম দাঁড়।

দিনের আলো নিভে আসে
অপরাহ্নের ছায়া আসে ঘনিয়ে,
এবং নীলকণ্ঠ ময়ূর বসে দাঁড়ে।
হাততালির তালে তালে ঘুরে ঘুরে নাচে প্রেয়সী।
অমনি সুনীল কণ্ঠ উন্নত করে ময়ূর,
তালে তালে নেচে নেচে আনন্দ-বন্যা প্রবাহে ভেসে যায়।

সাথে প্রেয়সী হস্তশোভিত চুরিবালা রুনু ঝুনু বাজে,
আহারে, কী স্বপ্ন, কী স্বপ্নিল আবেশ !
কিন্তু, এবে দাঁড় শূন্য। প্রেয়সী নেই, সে আসবে কেন ?
একজনের শোকে অন্য জনও শোকাহত।
আমি জানি প্রেয়সী কোথায়।
দেখবে তাকে ? আমার প্রেয়সীকে ?
ওখানে গিয়ে বসো—মনিমাণিক্যখচিত শৈল নিতম্ব দেশে।
পালঙ্কে যে অনিন্দ্য সুন্দরী, সেই-ই
হতভাগ্যের প্রিয়তমা—বিরহ ঝঞ্ঝায় লুণ্ঠিত লতিকা—
আমার দ্বিতীয় জীবন সদৃশী,
কোন দিনই বাচালতা জানে না,
বেশি কথা কয় না
একমাত্র সঙ্গী মোর অদর্শনে—
চক্রবাককে হারিয়ে চক্রবাকী
একেবারে নীরব, মৃত্যু সম শীতল।

বয়েস ? বড়ো জোর ষোল।
দীর্ঘ অদর্শন, অসহ্য বিরহ, উৎকণ্ঠা
কী করে সে সয় ?
অনুপম-যৌবনার অপূর্ব যৌবনকান্তি
হয়তো নেই, হয়তো তুষার পীড়িত কমলের মতো।

হয়তো দেখবে পূজা পার্বন নিয়ে ব্যস্ত
আমারই মঙ্গল কামনায়।
হয়তো শুনতে পাবে পিঞ্জরে আবদ্ধ সাধের
সারিকাটিকে বলছে—ঃ
সারি লো, কতো রসের কথাই'ত বলতিস,
তার সনে কতো আমোদ আহ্লাদই না করতিস,
কতো ভালবাসতেন তোকে—মনে পড়ে ?
হয়তো ক্রোড়ে বীণাটি রেখে আছে বসে,
মলিন কাপড়ে ঢাকা মলিন উৎসঙ্গে
বীণাটি রেখে সুরে সুর মেলাবার চেষ্টা।

কিন্তু, পারছে কই ?
সুর তুলতে যেতেই চোখের জলে বান ডাকে,
সিক্ত বীণায় সুর ফোটে না।
হয়তো দেখবে চৌকাঠের এক পাশে
এক কোনে নির্বাক, শুকনো ফুল গুনছে বসে।
যেদিন বিদায় জানিয়ে চলে আসি
সেই দিন থেকে রোজ এক একটি করে
উৎসর্গ করেছিল আমাকে, আট মাসে
প্রায় দু'শ চব্বিশটা।

অথবা দেখবে গৃহ প্রাচীর গাত্রে দেহবল্লরীটী
এলিয়ে দিয়ে নিমীলিত নেত্র ;
প্রাণের মধ্যে যে প্রাণ সেই প্রাণে প্রাণে
আমার সনে কল্পিত সংসর্গ উপভোগরত।

যক্ষপ্রিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে যেন যক্ষ হয়ে গিয়েছিলাম।
যক্ষ তবুও জানে তার প্রিয়া কোথায়,
সে জানে তার প্রিয়া কেমন,
সে জানে তার প্রিয়া কতোটা তাকে ভালবাসে ;
কিন্তু আমি' ত জানিনা আমার প্রিয়া কোথায়,
আমি' ত জানিনা আমার প্রিয়া কেমন,
আমি' ত জানিনা কাকে যে ভালবাসে আমার প্রিয়া !
যেখানেই থাক, যে রূপেই থাক, জেন
আমি তোমারই, শুধু তোমারই—
তোমারই তরে অক্ষত অব্যয়।
দুষ্টু যারা নিন্দুক বলতেই পারে তারা
জন্মান্তরের ব্যবধানে আগের সেই বাঁধন, সেই টান
অটুট থাকে কি করে ?

কিন্তু ভরসা রাখ মানসী,
কী মনে হয় জান ?
আমার মনটা যেন তোমার মুঠোয়।

মুক্ত করে যে অন্য কাওকে দেব
প্রেমিক হব, কোথা সে উপায় ?
ঈর্ষাকাতর তুমি তোমার যে ষোল আনা চাই।
এক আনাও যদি ছাড়তে এজন্মে,
তবুও সংসার পেতাম।
যাক্, বিগড়াবার পাত্র আমি নই
নেহাৎ অপ্রেমিক নগদ বেচাকেনা সর্বস্ব
জানে না চাহে না অন্য কিছুই,
সেই আহাম্মকরা বলে—বিরহতাপে শুকিয়ে যায় স্নেহ,
কর্পূরের মতো উবে যায় প্রেম।
তারা' ত জানে না—
কতো ভাবে কতো রূপে সাজিয়ে নিই তোমাকে,
হৃদয় কাননের কতো কুসুম রাখি তোমার খোঁপায়
হৃদয় চুয়ানো রক্তে রাঙিয়ে দেই তব ঠোঁট ;
অন্তর গহন থেকে মুক্তো তুলে নিয়ে সাজিয়ে দেই দু'কর্ণ !
আমার নিপুন শিল্পী হৃদয়ের সর্ব মাধুরী
সমগ্র সত্তা দিয়ে সাজাই তোমাকে—
অরূপকে বাঁধি রূপের বাঁধনে।

মিলন কালের স্নেহ বিচ্ছেদকালে
অগাধ অপ্রমেয় প্রেমহিল্লোলে পরিণত।
মিলন কালে যে স্নেহের শতো মুখ
আজি বিচ্ছেদে তার যেন সহস্র লোচন।
কোন যুক্তিতে বোঝাতে পারিনে নিজেকে
কী করে অরূপ এক অপরূপা যাকে দেখিনি
কখনো একটু চোখের দেখাও—
মন যাকে গড়েছে শুধু আপন খেয়ালে
সেই-ই জীবনে আমার সব চেয়ে বড়ো অস্তিত্ব।

কী নিষ্করুণ রসিকতা।
নিজেও এলে না, ঘেঁষতে দিলে না অন্য নারীকেও।
নারী বিবর্জিত জীবন নিয়ে লোকে
কতো কি যে বলে—ওরা যে বোঝে না
আমি বিরাট রাজার গৃহে বৃহন্নলা।
তবুও চুপ করে যেতে হয়
জীবন পথে একলা নিঃসঙ্গ মূক পথিক।
মানসীর মতোই মৌন,—
শুধু উপলব্ধি, শুধুই অনুভূতি, শুধুই
মূর্তিগড়া আর ভাঙ্গা হৃদয় বালুকা বেলায়।

কোন গ্রহলোকে, কোন সৌরলোকে কিংবা ছায়া পথে বসে
খেল এখেলা আপন মনে
আমাকে নিয়ে এ কী খেলা,
নিষ্করুণ নিদারুণ লীলা খেলা!
হয়তো বলতে পারতো দার্জিলিং' এর মেঘ
সাদা তুলো তুলো মেঘ
তেজি মোষের মতো কালো কালো মেঘ,
অগুন্তি চিমনি থেকে ছুটে আসা
ধোঁয়ার মতো রহস্যঘন মেঘ,
অবোধ নিদ্রাকাতর শিশুর মতো
গিরি দেহে শুয়ে থাকা নিরীহ নিষ্পাপ আদুরে মেঘ!

দ্বিতীয় খণ্ডের শুরু এখান থেকেই

২য় খণ্ড—আজি হৃদয় রাঙ্গা

প্রকাশ: ৩০শে শ্রাবণ

পূর্ববর্তী গ্রন্থ তমোরি